ভে ত রে

সরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রকল্প ... ২
পুঁজির সুরক্ষায় শ্রমকে করা হল অরক্ষিত ... ৩
শিক্ষাক্ষেত্র এখন নৈরাজ্যের স্বর্গরাজ্যে পরিণত ... ৪
রাজ্যে একশ দিনের কাজ বন্ধ আর ৫
রাজনীতি এখন ঃ অভিসারী প্রবণতা ... অপসারী ... ৬
অসরকারি সংস্থাগুলো সম্পর্কে আই বি রিপোর্ট ... ৭

গণদাবী

₹২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ২০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৩ জুলাই ২০১৪

সি পি আই (এম এল) পরিদর্শনকারী দলের রিপোর্ট

বন্ধ রায়পুর চা বাগানে অপুষ্টিজনিত কারণে চারদিনে মৃত ৬ জন

(গত ২৩-২৬ জুন চার দিনে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রায়পুর চা বাগানে ২টি শিশু সহ ৪ জনের অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস দলের মন্ত্রী-নেতা সহ বিভিন্ন সংসদীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বাগানে গিয়ে সাহায্য প্রদান সহ প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণসহ বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের নিজস্ব মতামত সংগ্রহ করতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল ৩০ জুন বাগান পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক সুভাষ দত্ত, জেলা কমিটির সদস্য বিজন সরকার, জলপাইগুড়ি শহর কমিটির সদস্য রাম ভগৎ ও প্রশান্ত ভৌমিক এবং প্রদীপ গোস্বামী।)

বাগানে উপস্থিত হওয়ার পর সাক্ষাত হল আমাদের জন্য অপেক্ষামান পার্টি সদস্য বিজয় ওরাওঁ ও স্বপন হালদারের সাথে। তাঁরা প্রথমে আমাদের নিয়ে গেলেন বাগানের গুদাম লাইনের বাসিন্দা আনুমানিক সত্তর বছরের ফাগু মুণ্ডার শ্রমিক আবাসে, যাঁর পুত্রসন্তান জিতবাহান মুণ্ডা দীর্ঘ তিন বছর অপুষ্টির কারণে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৬ জুন মারা গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর মাত্র। তিনমাস পূর্বে মৃত জিতবাহানের মা মাণ্ডি মুণ্ডাও (৫৫) অপুষ্টিজনিত রোগে মারা গেছেন। মৃত জিতবাহান চা বাগিচার নথিবদ্ধ শ্রমিক ছিলেন। অপুষ্টির কারণে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনি তিনবছর আগে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছিলেন।

এছাড়া মৃত্যু হয়েছে তিস্তা লাইনের রামু ওরাওঁ, ভগত লাইনের তিতরি বরাইক ও গুদাম লাইনের স্বরপিনা তিরকীর। এঁরা প্রত্যেকেই বয়স্ক ছিলেন। মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ বলা হলেও এঁরাও অর্থাভাবে দীর্ঘদিন অনাহার-অর্ধাহারে দিনযাপন করতেন।

মায়ের অপুষ্টিজনিত গর্ভধারণের ফলে রাজারাম রজক ও লোগা মুণ্ডার সদ্যোজাত শিশুপুত্রদ্বয় মারা যায়।

ধীরে ধীরে ফাগু মুণ্ডার শ্রমিক আবাসে সমবেত হল জ্ঞান তিরকী, মংরা মুণ্ডা, রাজীব মুণ্ডা, শেবী মুণ্ডা, ইন্তি মুণ্ডা প্রমুখ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা। তাঁদের সাথে কথায় কথায় যা কিছু জানা গেল সে কথায় আসা যাক।

দীর্ঘ ১১ বছর ধরে বাগান বন্ধ আছে, যদিও দুজন চা ব্যবসায়ী এর মধ্যে দুবার অল্পসময়ের জন্য বাগান অধিগ্রহণ করেছিলেন। ২০০৭ সালের মাঝামাঝি জলপাইগুড়ি শহরের ব্যবসায়ী বাজী গুহ বাগান অধিগ্রহণ করেছিলেন, আনুমানিক এক বছর তিনি বাগান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি জলপাইগুড়ি শহরাস্থিত একটি সমবায় ব্যাঙ্কের আর্থিক তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হন এবং তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ফলে তিনি বাগান ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী রাইমণ সাহা বাগান অধিগ্রহণ করেন ২০০৯ সালে। এই ব্যক্তিটির ইতিহাস আরও ভয়ঙ্কর। তিনি সুকৌশলে চা-বাগানের ফ্যাক্টরির সমস্ত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও বাগানের চা-পাতা বহনের গাড়ীগুলো মেরামতির নামে শিলিগুড়ি নিয়ে যান, যা আজও বাগানে ফেরত আসেনি। জীবিকার তাগিদ ও সরল বিশ্বাসে বাগানের শ্রমিকেরা তাঁর কাজে কোন বাধা দেননি। এরপর তিনি বাগান ছেড়ে পালিয়ে যান। তারপরে ২০১২ সালে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বাগানের বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে আসে। কারণ সেই ব্যাঙ্ক থেকে বাগানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন জনৈক রাইমণ সাহা। কিন্তু এবার বাগানের সমস্ত শ্রমিক একজোট হয়ে তিরধনুক নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন বাগান ছেড়ে যেতে।

বর্তমানে বাগানে ও এম সি (অপারেটিং ম্যানেজমেন্ট কমিটি) প্রথায় বাগান চলছে। শ্রমিকেরা কাঁচা চা পাতা তুলছেন এবং তার একত্রিতকরণ করা হচ্ছে। অকশনের মাধ্যমে প্রতিদিন কাঁচাপাতা বিক্রি হচ্ছে। সপ্তাহান্তে শ্রমিকেরা বিক্রয়লব্ধ অর্থরাশি থেকে সমানুপাতিক মজুরি পাচ্ছেন, যা আনুমানিক প্রতিদিন প্রায় গড়ে ৬০/৭০ টাকার মধ্যে।

দীর্ঘ ১৯ বছর যাবত শ্রমিকেরা ১৯৫৫ সালে তৈরী চা বাগিচা শ্রম আইনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং সরকারি বিভিন্ন অনুদান থেকেও বঞ্চিত। দীর্ঘ ৬ বছর যাবত বন্ধ চা বাগিচা শ্রমিকদের প্রাপ্য ফাউলাই স্কীমের টাকা পাওয়া বন্ধ আছে, শুধুমাত্র বছর দেড়েক পাওয়া গিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দীর্ঘদিন অমিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ২ কোটি টাকা অমিল। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এবছর এখনও পর্যন্ত ১২ দিন কাজ হয়েছে, আরও ৩ দিন হওয়ার কথা। গত ডিসেম্বর মাসে করা দশদিনের কাজের টাকা আজও শ্রমিকরা পাননি, নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক বিভিন্ন অজুহাতে বিলম্ব করছে।

দীর্ঘদিন বাগান পরিচর্যা বন্ধ, চা গাছের নীচে বিষাক্ত খাস জন্মেছে, চা পাতা তোলার সময় তা

চারের পাতায় দেখুন

তাপস পালের হুমকির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সভা

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তাপস পাল চূড়ান্ত অশালীন ভাষায় ফ্যাসিস্ত আক্রমণাত্মক হুমকি দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে ধিক্কারের ঝড় উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশান, এ আই এস এ, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি একযোগে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে পথে নামতে শুরু করেছে।

নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরিতে ১ জুলাই নাকাশীপাড়া পার্টি কমিটি প্রতিবাদ সভা করে। পার্টির জেলা কমিটির সদস্য সেলিম মন্ডল ও স্থানীয় পার্টি নেতা শিশির বসাকের নেতৃত্বে প্রকাশ্য রাস্তায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তাপস পালের কুশপুতুল দাহ করা হয়। তারপর স্থানীয় নাকাশীপাড়া থানায় ডেপুটেশন দিয়ে তাপস পালের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে। এফ আই আর করেছেন প্রগতিশীল মহিলা সমিতির স্থানীয় অন্যতম নেত্রী সাধনা সরকার। বিক্ষোভ সভা থেকে তাপস পালের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রশাসনিক-পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া এবং তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করার দাবি তোলা হয়।

একইদিনে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করে ছাত্র সংগঠন এ আই এস এ এবং সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির কলকাতা শাখা। তেতে ওঠা সভা থেকে বক্তারা প্রশ্ন তোলেন, তাপস পালকে এখনও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? তাঁর সাংসদ পদ এখনও খারিজ করা হচ্ছে না কেন? এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ি করে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়। কারণ তাঁর লাগাতার প্রশ্রয় দেওয়া মন্তব্য, প্রতিটি জঘন্য উক্তি ও অপরাধমূলক আচরণকে পরিকল্পিতভাবে লঘু করে দেখিয়ে আসার দৌলতেই তাপস পালদের ফ্যাসিস্ত আক্রমণাত্বক হুমকি দিনদিন বাড়ছে। এরাজ্যে একটিও ধর্ষণের বিচার উপযুক্ত গতি পাচ্ছে না, ধর্ষণকারীরা এতটুকু ভয় পাচ্ছেনা। তার ওপর তৃণমূলী 'জনপ্রতিনিধি' থেকে শুরু করে তালেবর নেতারা কখনও 'জনপ্রিয়তা'র অনুভূতি বোঝাতে গণধর্ষিত হওয়ার মজা উপভোগ বোঝাচ্ছেন, কখনও বিরোধীদের শায়েস্তা করতে গণধর্ষণকে হাতিয়ার করার ও গুলি করে মারার হুমকি দিচ্ছেন। এই ধরণের সমস্ত অভিযোগ উপরন্তু খোদ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায় আড়ালও পেয়ে যাচ্ছে। খুব বেশী চাপ বুঝলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযুক্ত তৃণমূলীকে একটু লোকদেখানো বকুনীর বুকনি শুনিয়ে অথবা তথাকথিত 'মার্জনা' আবেদনের চিঠি লিখিয়ে সব বিক্ষোভে জল ঢেলে দিচ্ছেন। বর্তমান শাসকদলের চূড়ামনিদের যা চেহারা কুলাঙ্গার বাছতে গেলে টি এম সি উজার হয়ে যাবে। কলেজ স্কোয়ারে বিক্ষোভ শেষ হওয়ার পর মিছিল করে ঐ চত্বরে পরিক্রমা করা হয়। বেশ কিছু নাগরিকও মিছিলে সামিল হয়ে যান। প্রেসীডেন্সী কলেজের সামনে তাপস পালের প্রতিকৃতি দাহ করে সাফ বলে দেওয়া হয় দাবি না মানলে আন্দোলন জারী থাকবে।

হুগলি জেলার চুঁচুড়া ঘড়ি মোড়ে শহর পার্টি কমিটির পক্ষ থেকে ২ জুলাই বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, জেলা কমিটি সদস্য মুকুল কুমার ও শহর পার্টি কমিটি সম্পাদক স্বপন গুহ।

চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে।

পি জি নায়েক কমিটির রিপোর্ট

সরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার নয়া প্রকল্প

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর পরিচালনা (বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্) ব্যবস্থার উন্নতি এবং প্রয়োজনীয় পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (আর বি আই) এ বছরের জানুয়ারি মাসে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। এই কমিটির শীর্ষপদে আসীন হন বেসরকারি এ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী পি জে নায়েক। শ্রী নায়েক সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড (সেবি)-এর সদস্য এবং স্ট্যানলি মর্গানের প্রাক্তন ভারতীয় অধিকর্তা। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের জন্য নির্ধারিত কাজের পরিধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র ৫ মাসের মধ্যেই নায়েক কমিটি কাজ শেষ করে প্রায় চৌদ্দ দফা সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক এবং আর বি আই-এর কাছে জমা দিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল বিগত ইউ পি এ সরকারের জমানায় জানুয়ারি ২০১৪ কমিটি গঠন করা হয় এবং সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের প্রাক্ মুহূর্তে ১৩ মে ২০১৪ কমিটির সুপারিশ সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশিত হয়। আর্থিক সংস্কারের প্রশ্নে কংগ্রেস, বিজেপি যে একই অবস্থানে আছে নায়েক কমিটির রিপোর্টে তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন শ্রী এস রমন, রাষ্ট্রায়ত্ত ও কানাড়া ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান; এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীমতী শুভলক্ষী পান্‌সে; সেবির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী প্রতীপ কর; শ্রী জয়দীপ সেনগুপ্ত, ম্যাকিন্‌সে এণ্ড কো-র প্রাক্তন ডিরেক্টর; শ্রী হর্ষবর্ধন বাইন এণ্ড কোম্পানির অংশীদার; সোমশেখর সুন্দরেশন, অন্যতম অংশীদার জে সাগর এণ্ড এ্যাসোসিয়েটস এবং ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস হায়দ্রাবাদের সহকারী অধ্যাপক শ্রী কৃষ্ণমূর্তি সুব্রামানিয়ান। এই কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন বা কর্মচারিদের কোন প্রতিনিধিকে রাখা হয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অন্যান্য লগ্নীকারি সংস্থারও কোন প্রতিনিধি জায়গা পাননি। ৮ সদস্যর তিন জন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকলে বাকী ৫ জনই পুঁজিবাজারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে যে নায়েক কমিটি রিপোর্ট পক্ষপাতদুষ্ট এবং দুরভিসন্ধিমূলক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিলুপ্তির নয়া কৌশল।

দেখতে বলা হল বোর্ডের সমস্যা,
পরামর্শ এল সরকারি ব্যাঙ্ক তুলে দেওয়া

বর্তমানে যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বোর্ডের চেহারাটা এরকম—(ক) সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডার (নন্ গভর্নমেন্ট সংস্থা)-দের প্রতিনিধি হিসাবে ৩ জন সদস্য। (ক) বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের ৩ জন। (গ) ভারত সরকার/কর্মচারি/অফিসার/নিয়ামক সংস্থা আর বি আই প্রত্যেকের তরফে একজন করে মোট ৪ জন। (ঘ) ব্যাঙ্কের অডিট কমিটির প্রধান একজন চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। (ঙ) সি এম ডি সহ ৩-৪ জন সর্বক্ষণের ডিরেক্টর।

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় ১৪ অথবা ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক বোর্ডে ১০ জনই কোন না কোনভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তত্ত্বধানে নিযুক্ত আছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুসারে নায়েক কমিটির বিচার্য বিষয় হল—

(১) একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নিয়ামক সংস্থা হিসাবে আর বি আই-এর কর্তৃত্ব কি বোর্ডের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

(২) বোর্ড মেম্বার (ডিরেক্টর) নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতিতে দক্ষ এবং উপযুক্ত ডিরেক্টর নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে কি?

(৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো উচিত কি না?

(৪) বোর্ড মেম্বারদের পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তাদের পর্যাপ্ত উৎসাহভাতা প্রদান।

(৫) ব্যাঙ্কের বোর্ডের কাজকর্ম সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সিভিসি) এবং তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতা মুক্ত করা প্রয়োজন কিনা?

নায়েক কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বোর্ডের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রথমেই দরকার ব্যাঙ্কের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেওয়া। এক্ষেত্রে সরকার বৃহত্তম লগ্নীকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ কার্যকরি করার উদ্দেশ্যেই সরকারি শেয়ারের পরিমাণ ৫১ শতাংশের নীচে রাখতে হবে।

ব্যাঙ্কের মতন আর্থিক শিল্পে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং সরকারের সর্বাঙ্গীণ অংশগ্রহণের এক মডেল তৈরী করতে হলে নায়েক কমিটির পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ হল, সমস্ত সরকারি শেয়ার একটি ভিন্ন সংস্থায় স্থানান্তরিত করতে হবে। কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত এই ভিন্নতর সংস্থাকে বলা হবে ব্যাঙ্কিং ইন্‌ভেস্টমেন্ট কোম্পানি (বি আই সি)। এর পর থেকে কোন ব্যাঙ্কে কি পরিমাণ সরকারি লগ্নী হবে তা ঠিক করবে বি আই সি। এই সংস্থার সি ই ও (চীফ একজিকিউটিভ অফিসার) হতে হবে একজন পেশাদার এবং দক্ষ ব্যক্তি, শেয়ার বাজার নিয়ে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্কের বোর্ডে থাকবে স্থায়ী ডিরেক্টর এবং ৫ বছর মেয়াদের চেয়ারম্যান।

কমিটির সুপারিশ ও প্রস্তাবগুলো হল—

(১) ১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইনের যে ধারা বলে প্রথমে ১৪টি এবং পরে ৬টি মোট ২০টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক অধিগ্রহণ করা হয়েছিল সেই আইনটি বাতিল করে দিতে হবে এবং ব্যাঙ্কগুলো নতুনভাবে কোম্পানি আইনে নথিভুক্ত হবে।

(২) ব্যাঙ্কের সরকারি মালিকানা একটি ভিন্ন লগ্নীকারি সংস্থা বি আই সি-তে স্থানান্তরিত করতে হবে।

(৩) সরকারের শেয়ার ৫১ শতাংশের নীচে রাখতে হবে এবং সরকারের তরফ থেকে কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ বা বিধান দেওয়া যাবে না যা বোর্ডের কাজে হস্তক্ষেপের সামিল।

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বোর্ডে সরকার মনোনীত কোন সদস্য থাকবেন না। একই সঙ্গে নিয়ামক সংস্থা আর বি আই-এর মনোনীত প্রতিনিধিকে বোর্ডের পদ ছেড়ে দিতে হবে।

(৫) ব্যাঙ্ক বোর্ডকে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স এবং আর টি আই-এর আওতার বাইরে রাখতে হবে।

নায়েক কমিটির যুক্তি হল ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই পুঁজি হ্রাস পেয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর পুঁজি যোগান দেওয়া সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে গেলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক প্রাইভেট করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

নায়েক কমিটি সত্য তথ্য দিচ্ছে না

ব্যাঙ্কের ব্যবসায় পুঁজির ভূমিকা অত্যন্ত কম। সাধারণ মানুষের সঞ্চিত অর্থ বা জমানো আমানতই হল ব্যাঙ্ক ব্যবসার অন্যতম উৎস। ১৯৬৯-২০১৪ এই সময়ে ব্যাঙ্কের আমানত ৫০০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আসলে এক সামাজিক পুঁজি হিসাবে পরিগণিত হয়। একই সময়ে সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্কের সামগ্রিক সম্পত্তির পরিমাণ ২ লক্ষ ৯ হাজার কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পিত ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা না থাকায় অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে সন্দেহ নেই। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তরফ থেকেই ৪০০ জন ঋণ খেলাপীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে যাদের কাছে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৭৩,০০০ কোটি টাকা।

বোর্ডের উৎকর্ষতার বিষয়েও যদি ধরা হয় তাহলে বলতে হবে যে ২০০৭ সালে আমেরিকায় আর্থিক ধস কেন হল? সেখানকার সমস্ত ব্যাঙ্কেই তো বেসরকারি দক্ষ এবং পেশাদার বোর্ড সদস্য ছিলেন। ব্রিটেনে বৃহত্তম ব্যাঙ্ক রয়াল ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যাণ্ড কেন মুখ থুবড়ে পড়ল? ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি (এফ এস এ)-র মতন প্রখ্যাত পরামর্শদাতা সংস্থার মতে এই ব্যাঙ্কগুলো পরিচালন কাঠামোর কোন সমস্যা ছিল না, বরং বোর্ডের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ করার কেউ ছিল না।

প্রচলিত আইনে পরিচালকমণ্ডলীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ আছে। সেই পরামর্শ না দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ভেঙ্গে দেওয়ার সুপারিশ যে রাজনৈতিক স্বার্থপুষ্ট তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখন দেখা দরকার, 'সুদিন' আনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কত দ্রুত দুর্দিনের সুপারিশ কার্যকর করছে। অন্যদিকে বিরোধী রাজনীতি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র রক্ষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়তে পারে কি না। **- নির্মল ঘোষ**

সম্পাদকীয়

কবর থেকে উঠে আসা প্রশ্নগুলো ভীষণ জ্বলন্ত

উত্তরবঙ্গের চা বাগানে আবার শ্রমিকের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার খবর। সর্বশেষ মরণের সাক্ষীস্থল জলপাইগুড়ির বন্ধ থাকা রায়পুর চা বাগান। মৃত শ্রমিকের নাম জিতবাহান মুণ্ডা, তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েকবছর আগে নিদারুণ অভাব আর দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করতে করতে। জিতবাহানও লাশ হয়ে গেলেন। তাঁর নামের মর্মার্থ সহজবোধ্যভাবে যদি ধরে নেওয়া যায় তিনি জিতে নেওয়ার বান্দা, তো তাঁকে জীবনযুদ্ধে লড়তে লড়তে অবশেষে নিথর হয়ে যেতে হল। তাঁকে যুঝতে হয়েছে বাঁচার অযোগ্য কাজ, মজুরি, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পথ্য, পানীয় জল, বসবাসস্থল নিয়ে। সে এক লাগাতার রক্তশূন্য-কান্না-ঘামে ভেজা তিক্ত নির্মম যুদ্ধ। যার অনিবার্য পরিণাম অকালে ত্বরান্বিত মরণ। জিত পরিবারে কাকে কীভাবে রেখে যেতে বাধ্য হলেন! দিশেহারা হয়ে পড়া অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা আর দুই নাবালিকা কন্যা। এরপর কে তাদের দেখবে? কীভাবে তাদের চলবে? ঘরে যাদের খিদের জ্বালা মেটানোর রসদ থাকে না, তাদের আবার কবর দেওয়ার সঙ্গতি থাকবে কোথা থেকে? জেলা সদর ব্লকের যুগ্ম বিডিও অর্থ সাহায্য দিলে তবেই কবর দেওয়া সম্ভব হল। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য একশ দিনের কাজের মজুরিতে কবর খোঁড়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আইনে বাধা রয়েছে তাই প্রশাসনিক আপত্তিতে তা হয়নি। হায়! যে প্রকল্প জীবন-বাঁচানোর, এমনই দুরবস্থা, সেই টাকায় হাত পড়ার উপক্রম হয়েছিল মৃতের কবর খুঁড়তে! শাসকদল দয়াবান পরিচয় দিয়ে মৃতের পরিবারকে নাকি হাজার চারেক টাকা দিয়েছে। কবর দেওয়ার কাজ শাসকদল ও পুলিশ-প্রশাসনের সতর্ক নজরদারিতে শান্তিপূর্ণভাবে সারা হয়েছে। তার আগে ক্ষোভ যথারীতি ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা না হলেও উপশম হওয়ার নয়।

জিতবাহান মুণ্ডার পরিণতি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোটা উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা বছরের পর বছর বর্ণনাতীত শোষণ-বঞ্চনার শিকার। অনাহারে শ্রমিকের মৃত্যু মিছিল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যণীয় চা শিল্পক্ষেত্রেই । রায়পুর চা বাগানেই জুন মাসের শেষ আট দিনে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা গড়িয়েছে ছয়। গত তিন বছরের তৃণমূল রাজত্বে চা ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিবারে মৃতের সংখ্যা অর্ধশত অতিক্রম করে গেছে। কাজ নেই, মজুরি নেই, খাদ্য নেই, চিকিৎসা নেই, পরিশ্রুত পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, বসবাসের উপযুক্ত ঘরদোর নেই। সবচেয়ে বড় দুর্দশা অনাহার ব্যাপকভাবেই নিত্যসঙ্গী। মৃত জিতের সংবাদপত্রে ছবি বেরিয়েছে হাড় জিরজিরে শয্যাশায়ী। এ ছবি উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক মহল্লাগুলোর ঘর ঘরের ছবি।

জিতবাহানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের বিশেষত দুই মন্ত্রীর দুরকম কথা ধূমায়িত ক্ষোভে আরও জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শ্রমমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হয়েছে মৃত্যু ঘটেছে 'অপুষ্টির কারণে', তিনি কিছুটা রেখে ঢেকে বলেছেন, মৃত্যু হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে অনাহার, অপুষ্টি, ক্ষয়রোগের কারণে। শ্রমমন্ত্রী যদিও দাবি করতে ছাড়েননি তাদের সরকারের গৃহীত সামাজিক ও খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের দৌলতে অপুষ্টিতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমেছে! অথচ এক বিডিও স্বীকার করেছেন জি আর দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও ডীলারের সমস্যায় আটকে গেছে। মহকুমা শাসক বলেছেন, যক্ষাক্রান্তদের পাঠানো হবে হাসপাতালে, আর বাকীদের জন্য চালু হবে 'পুষ্টি শিবির'। প্রশাসনিক এই মন্তব্যগুলোই বুঝিয়ে দেয় হাল কি দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি সমীক্ষায় ধরা পড়ছে যেখানে অপুষ্টিতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ছে, শ্রমমন্ত্রী তখন উল্টো তথ্য-পরিসংখ্যান গাইছেন। খাদ্যমন্ত্রী আবার এককাঠি ওপরে, অনাহারে-অপুষ্টিতে মৃত্যুর সত্যতা মানতেই রাজী নন। তাঁর দাবি মৃত্যু হয়েছে লাগাতার চোলাই মদ খাওয়ার কারণে পিলে পচে গিয়ে। তাঁর কথা হল, দু'টাকা কেজি দরে চাল বিলির কর্মসূচী চালু রয়েছে। অতএব অনাহারে মৃত্যুর তথ্য তিনি মানতে নারাজ। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী, যিনি উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন পর্ষদ কেলেঙ্কারী থেকে শুরু করে পাহাড়-সমতল বিভাজনের রাজনীতিতে কলঙ্কিত, তিনিও মৃত্যুর পেছনে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোর অকার্যকারিতাকে কেন্দ্র করে শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। আর এ রাজ্যের 'অনন্যা' মুখ্যমন্ত্রী! যখন অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে চা শ্রমিকের, তা নিয়ে একেক মন্ত্রী একেক রকম গলাবাজী করছেন, তখন মাননীয়ার কোনও কণ্ঠনাদ নেই, তিনি ভীষণ ব্যস্ত রাজ্যশাসনে! অবসরে হয়তো বা 'পরিবর্তনের' ছবি আঁকছেন, দিবারাত্রির কাব্য লিখছেন। রাজ্যে এখন 'পরিবর্তন' আসার এমনই জোয়ার যখন 'অন্নপূর্ণা'-'অন্ত্যোদয়' সহ সামাজিক প্রকল্পগুলো নাকি বাড়ছে! আবার পাল্লা দিয়ে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। কি বিচিত্র বৈপরীত্যের সহাবস্থান চলছে। বেসামাল অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে এই মন্ত্রী সেই মন্ত্রীরা হচ্ছেন আরও বেসামাল, আরও হাস্যকর, আরও উন্মত্ত। জিতবাহানের কবর থেকে উঠে আসা প্রশ্নগুলো ভীষণ জ্বলন্ত।

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ
আজকের দেশব্রতী পড়ুন

পুঁজির সুরক্ষায় শ্রমকে করা হল অরক্ষিত!

নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসার পরপরই কর্পোরেট ঘরানা তাদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে চাপ দেওয়া শুরু করেছে। আরও বেশি বিনিয়োগ ও ব্যাপক পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির খুড়োর কল দেখিয়ে মুনাফার পাহাড়কে আরও বাড়াতে শ্রমের বাজারে নতুন করে হামলা নামিয়ে এনেছে পুঁজি। আওয়াজ উঠেছে, **'যৎসামান্য শ্রম আইন-ই একমাত্র ভারতবর্ষে উন্নত মানের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে।'** বিজেপি তার নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, 'সেই সমস্ত শ্রমকানুনকে তারা পুনর্মূল্যায়ন করবে যেগুলো সেকেলে, জটিল এমনকি পরস্পর-বিরোধী'। তাই, ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদী তাঁর কথা রাখবেন, এই আশায় মশগুল শিল্প ঘরানা।

আর এই কাজে 'অগ্রণী' ভূমিকা রেখেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজস্থান রাজ্য সরকার। রাজস্থান সরকারের মন্ত্রীসভা ইতিমধ্যেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শ্রম আইনের উপর সংশোধনী এনেছে—**শ্রমকানুনের 'কঠোর শৃঙ্খল থেকে কর্পোরেট সেক্টরকে মুক্তি দিতে'-ই নাকি এই সমস্ত সংশোধনী আনা হয়েছে। শিল্প বিরোধ আইন, কন্ট্রাক্ট শ্রমিক আইন এবং ফ্যাক্টরি আইন—এই তিনটি ক্ষেত্রে, জুলাই মাসের গোড়ায়, বিধানসভায় বিল আনা হবে, যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে সরকারের তরফ থেকে।** সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন (বি এম এস সহ) এই সংশোধনীর তীব্র বিরোধীতা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছে যেন কোন অবস্থাতেই রাজস্থান সরকারের সংশোধনীতে সায় না দেওয়া হয়। বিরোধীতা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। আবার, বিপরীতে, শিল্পমহল দু'হাত তুলে কুর্নিশ জানিয়েছে রাজস্থান সরকারকে। শিল্প বিকাশের জন্য, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নাকি এটাই একমাত্র দাওয়াই বলে প্রচার করছে শিল্পপতিরা। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''আমি ১৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর এটা হল এমনই এক ক্ষেত্র, যাকে হাটখোলা করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। আমার কাছে নেই অন্য কোন পথ।''

কী সেই সংশোধনী? কেন-ই বা তাকে কেন্দ্র করে এত হৈ-চৈ?

বর্তমানে শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ অনুযায়ী, ১০০ পর্যন্ত শ্রমিক যে সমস্ত সংস্থায় কাজ করেন, যেখানে ছাঁটাই করতে গেলে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী, এটাকে ৩০০ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ৩০০ শ্রমিক কাজ করেন এমন ইউনিটগুলোতে ছাঁটাই করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন থাকছে না। পাশাপাশি, শ্রম বিরোধ দায়ের করার সময়সীমা তিনবছর করা হয়েছে। এই সংশোধনী নতুন করে সূত্রায়িত করেছে রাজস্থান সরকার। ইউনিয়ন গঠনের জন্য ১৫ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থনের জায়গায় ৩০ শতাংশ সমর্থন বাধ্যতামূলক হচ্ছে।

কন্ট্রাক্ট শ্রমিক আইনের ক্ষেত্রে যে বদল আনা হচ্ছে, তা হল, যে সমস্ত ইউনিটে ৫০-এর অধিক কন্ট্রাক্ট শ্রমিক কর্মরত, সেখানে ঐ আইনটি কার্যকরী হবে। বর্তমানে ঐ সংখ্যাটি হচ্ছে ২০। বর্তমানে ফ্যাক্টরি আইন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় যেখানে ১০-এর অধিক শ্রমিক বিদ্যুৎ চালিত ইউনিটে এবং ২০ জনের অধিক শ্রমিক বিদ্যুৎ বিহীন ইউনিটে কাজ করেন। নতুন সংশোধনী অনুযায়ী ঐ সংখ্যাটি যথাক্রমে বাড়িয়ে ২০ এবং ৪০ করা হচ্ছে।

রাজস্থান সরকারের শ্রমিক বিরোধী মুখ

বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম অধিকার অর্জনের দাবিতে রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় পাথরেদি অঞ্চলে শ্রীরাম পিস্টনের শ্রমিকরা যখন আন্দোলন শুরু করেন, তখন তাঁদের উপর নেমে আসে নির্মম রাষ্ট্রীয় দমন। দিল্লী-মুম্বাই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল করিডরে এই ধরণের হামলা আজ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। উন্নত মজুরি ও চাকুরির নিশ্চয়তার দাবিতে এবং ২২ জন শ্রমিককে বেআইনিভাবে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে প্রায় ১২০০ শ্রমিক ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ থেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। লোকসভা নির্বাচন হওয়ার ঠিক দুদিন পর, ২৬ এপ্রিল সকালে প্রায় দু-হাজার পুলিশ, ১০০ জন বাউন্সারকে সঙ্গে নিয়ে নির্মম হামলা চালায়। প্রায় ১৫০ শ্রমিক আহত হন, চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬ জন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারা চাপিয়ে দেয়। বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক ঐ কারখানায় কন্ট্রাক্ট প্রথায় কাজ করতেন। ইউনিয়ন গঠন করার প্রতিটি পদক্ষেপকে শ্রম দপ্তর থেকে বানচাল করা হয়। ই এস আই, পি এফ ছাড়াই সামান্য মজুরিতে কর্মরত এই সমস্ত শ্রমিকদের উপর চলত অকথ্য মালিকী নির্যাতন। (সূত্র ঃ ই পি ডব্লিউ, ৭ জুন ২০১৪)

বিকাশের বুলি আউড়ে শ্রমিকদের অধিকারের উপর হামলা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে ভারতবর্ষ জুড়ে।

ন্যূনতম মজুরি আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনী

দেশব্যাপী ইনফর্মাল সেক্টরের বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে অস্থায়ী, কন্ট্রাক্ট বা ক্যাজুয়াল শ্রমিক সংখ্যা। বিশাল এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো বহুদিন যাবৎ করে আসছে। সম্প্রতি, মোদী সরকার ন্যূনতম মজুরি আইনকে সংশোধন করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

যে সংশোধনী কেন্দ্রীয় সরকার আনতে চলেছে, তা হল, জাতীয় স্তরে সমস্ত কর্মক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য অভিন্ন ন্যূনতম মজুরি (ন্যাশনাল ফ্লোর লেভেল) নির্ধারণ করা হবে, যার নীচে আর কোন মজুরি থাকবে না। ৫ বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার তা সংশোধন করবে এন এস এস ও-র সার্ভের ভিত্তিতে, আর রাজ্যগুলো ৬ মাস ব্যবধানে ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের নিরীখে তা সংশোধন করবে। ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য জরিমানা এমনকি গ্রেপ্তারের প্রস্তাব রয়েছে। থাকছে শ্রমিকদের জন্য উন্নত ক্ষতিপূরণ। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে অস্থায়ী, ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের লাগাতার বিক্ষোভ ক্রমেই এক প্রবণতা হয়ে সামনে আসছে। হয়ত এই বাস্তবতাকেই কেন্দ্রীয় সরকার এবার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে।

উৎপাদন শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাইকে সহজ করতে আইন সংশোধন

উৎপাদন শিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে উৎপাদনকে 'উৎসাহিত' করতে এবং জাতীয় উৎপাদন নীতি বা ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং পলিসির স্বার্থে মোদী সরকার শ্রম আইনকে সংশোধন করার কাজে হাত দিয়েছে।

পাঠকদের অবহিত করতে জানিয়ে রাখা ভাল যে, ২০১২ সালে, মনমোহন সিংহের জমানায় ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রি প্রমোশন বোর্ড (এম আই পি বি) গঠন করা হয় ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারিং পলিসিকে রূপায়িত করার লক্ষ্যে। জিডিপি-তে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অংশিদারিত্ব ২০২০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম লক্ষ্য নিয়েই জাতীয় উৎপাদন নীতি রচিত হয়। **এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য, সেজ-এর আদলে বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হবে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং জোন (এন আই এম জেড)।** বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই উৎপাদন শিল্পের অঞ্চলগুলো একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা, কর ছাড়, ঢালাও ভর্তুকি পাবে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখানে **পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি এবং শ্রমকানুন অনেক শিথিল করা হবে।** ইতিমধ্যেই পাঁচটি অঞ্চলে এন আই এম জেড-কে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। দিল্লী-মুম্বাই করিডরটি এরকম এক বিশেষ উৎপাদন শিল্পের অঞ্চল।

ইউ পি এ সরকারের আমলেই এই বিশেষ অঞ্চলগুলোতে শ্রম কানুনকে বদলানোর তোড়জোড় শুরু হয়। **পূর্বতন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা তার আমলে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের কাছে শিল্প বিরোধ আইনের ২৫ এফ এফ এফ (১এ) ধারাটিকে সংশোধন করার সুপারিশ করেন।** এখন মোদী সরকার সেটাকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কী সেই সুপারিশ? **এন আই এম জেড অঞ্চলগুলোতে যে কোন ইউনিট থেকে শ্রমিকদের অবাধে নোটিশ বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ছাঁটাই করা যাবে।** এই ছাঁটাই করা যাবে, যদি মালিক সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ঐ অঞ্চলেই বিকল্প কাজ দিতে পারে আগেকার মজুরি ও কাজের শর্তের ভিত্তিতে। **শ্রম আইনে এই পরিবর্তনটা খুবই মারাত্মক, কারণ বর্তমান আইনে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের জন্য এই সুযোগ দেওয়া হয়নি।** বর্তমান আইন অনুযায়ী, যে সমস্ত সংস্থায় ১০০-র বেশি শ্রমিক কর্মরত, সেখানে এক বছরের বেশি (অর্থাৎ, ২৪০ দিন) ধারাবাহিকভাবে কাজ করছেন এমন শ্রমিককে ছাঁটাই করার আগে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি এবং তিন মাসের নোটিশ দিতে হবে। সংশোধিত আইনে বলা হচ্ছে যে যদি কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই হওয়া শ্রমিককে বিকল্প কাজ দিতে না পারে, তবে সেই শ্রমিক যত বছর লাগাতারভাবে কাজ করেছেন, ততো বছর ২০ দিনের মজুরির হারের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

এই আদলে, বর্তমানে শ্রম বিরোধ আইনে একটি ধারা আছে, **যা খনি এলাকায় প্রযোজ্য।** খনি অঞ্চলে কোন খনিতে খনিজ নিঃশেষ হলে সেখানে উত্তোলন কাজ স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে, বর্তমান শ্রম বিরোধ আইনে রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি বা তিন মাসের নোটিশ ছাড়াই শ্রমিককে ছাঁটাই করা যায়। তবে, এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে তারই অধীনে, খনি বন্ধ হওয়ার ঘোষিত দিন থেকেই সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে বিকল্প কর্মসংস্থান দিতে হবে পূর্বতন মজুরি ও কাজের শর্তের নিরীখে; অথবা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কর্মরত বছরগুলোর ভিত্তিতে। খনি অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বর্তমান এই আইনটির অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছে গোটা উৎপাদন ক্ষেত্রটিকে। ইউ পি এ সরকারের শুরু করা কাজ, শেষ করতে চলেছে মোদী সরকার।

শ্রম কানুন শিথিল ও নমনীয় করার আসল উদ্দেশ্য কী?

ফিকি-র ডাইরেক্টর, লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট রাজপাল সিং শিল্পের স্বার্থে শ্রম আইনকে এমনভাবেই শিথিল ও নমনীয় করতে বলেছেন যাতে শিল্প ইউনিটগুলো সহজেই **স্থায়ী শ্রমিকদের ছাঁটাই বা বরখাস্ত** করতে পারে এবং শ্রমিকদের ধর্মঘট করার রাস্তাটাও যেন খুব কঠিন হয়ে যায়। 'যৎসামান্য শ্রম আইন-ই একমাত্র ভারতবর্ষে উন্নত মানের কর্মসংস্থান করতে পারে'—এমনটা বলার আসল অর্থ হল, **শ্রম আইনের আওতার বাইরে বেশীরভাগ শিল্প ইউনিটগুলোকে রেখে দেওয়া। ১৯৯৬-৯৭ সালে, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-বিজেপি সরকার বর্তমান শ্রম আইনে বিধৃত ছাঁটাইয়ের শর্তকে আরও শিথিল করতে চেয়েছিল। তখনই দেখা গেল যে, তা কার্যকরী হলে, ঐ রাজ্যে ৭৮ শতাংশ কারখানাই ঐ আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে।** আর রাজস্থান রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত সংশোধনী কার্যকরী হলে ঐ সংখ্যাটি আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। শ্রম আইন থেকে মুক্তি পেয়ে পুঁজি তার হামলাকে আরও তীক্ষ্ণ, তীব্র ও সর্বব্যাপী করে তুলবে। চাকুরির নিশ্চয়তা আরও বিপন্ন হবে। ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে শ্রমিক অসন্তোষ! ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের বিস্তৃত অসংগঠিত ক্ষেত্রটি, যেখানে ৯৩ শতাংশ শ্রমিক কর্মরত, শ্রম কানুনের বাইরে চলে গেছে। শুধুমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রের জন্যই থাকবে নখ-দাঁতহীন এক অকার্যকরী শ্রম আইন।

সারা ভারতবর্ষের জন্য রয়েছে ৪৭ কেন্দ্রীয় শ্রম আইন এবং রাজ্যগুলোতে সব মিলিয়ে ২০০-র মত ধারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান শ্রম কানুনের নানা সীমাবদ্ধতা, আইন কার্যকরী করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও মেশিনারির অভাব, মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রম দপ্তরের আঁতাত প্রভৃতি বহুবিধ কারণ শ্রম আইনকে অনেকাংশেই অকার্যকরী-অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় শ্রম অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য কেন্দ্র ও রাজ্য পৃথকভাবেও আইন প্রণয়ন করতে পারে।

শ্রম আইনকে বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে শিল্পমহল যতই চিত্রায়িত করুক না কেন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক সার্ভে অনুযায়ী মাত্র ১৫ শতাংশ সংস্থাই বিকাশের পথে শ্রম আইনকে বাধা বলে চিহ্নিত করেছে।

ভারতবর্ষ জুড়ে হু হু করে বেড়ে চলেছে কন্ট্রাক্ট শ্রমিক। বিভিন্ন প্রান্তে 'এজেন্সি' খোলা হয়েছে, যারা বিভিন্ন সংস্থায় কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের নিয়োগ করে, পরিবর্তে তাঁদের মজুরি থেকে কেটে নেয় ৪০-৪৫ শতাংশ। অ্যাসোচেম এক সমীক্ষা করে দেখেছে যে, দেশে কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে কাজ বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। অটোমোবাইল ও ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে, অ্যাসোচেমের সমীক্ষা অনুযায়ী কন্ট্রাক্ট প্রথায় কাজ করে যথাক্রমে ৫৬ ও ৫২ শতাংশ শ্রমিক। আর গত ২০ বছর ধরে ইনফর্মাল সেক্টরের কর্মসংস্থান হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই বিপুল সংখ্যক ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের উপর যেটুকু ছিটেফোঁটা শ্রম কানুন রয়েছে, তার শেষ আস্তরণটাও পুরোপুরি সরিয়ে পুঁজিকে অবাধ অর্গলমুক্ত করার অভিযানে নেমেছে মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার। - **অতনু চক্রবর্তী**

''মানুষের কাছে চিত্রকলা নিয়ে যাওয়া শিল্পীর দায়িত্ব''

মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনের ঢাকা বারান্দায় ''প্রতিরোধের সিনেমা''র পক্ষ থেকে দিল্লীবাসী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অশোক ভৌমিকের আঁকা বারোটি ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল গত ২৬ জুন। ১৯৭৫-৭৭-এর জরুরী অবস্থার উত্তাল সময়ে শিল্পীর পরিচয় হয়েছিল বিখ্যাত হিন্দী কবি মুক্তিবোধ-এর এপিক কবিতা 'অঁধেরে মে' (অন্ধকারে)-র সাথে। আশীর দশকে আঁকা বারোটি ছবিতে অর্চনা গুহর মতো বহুসংখ্যক নারীর ভাঙাচোরা দেহ, পট্টি বাঁধা মুখ আর বোবা চোখের সারি। সময়ের ডিম ঠোঁটে নিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে পাখি। ইমারজেন্সির আগে ও পরের একটানা 'জরুরী অবস্থা'কে ফুটিয়ে তোলা রেখাগুলির সাথে মিলে মিশে যায় মুক্তিবোধের অমোঘ লাইনগুলি। ''প্রতি রাতে নগরীর প্রেতাত্মারা বের করে শোভাযাত্রা/ আর দিনে ষড়যন্ত্রে হাত মেলায়/ অফিসে, করিডরে, ঘরের ভিতর''।

প্রদর্শনীর সাথে সাথে পাশের এক সেমিনার হলে ''ভারতীয় চিত্রকলায় প্রগতিশীল ধারা''র উপর বক্তব্য রাখেন অশোক। বাজারমুখী আধুনিকতা আর পশ্চাদমুখী ভারতীয় শিল্পের বাইরে জনমুখী শিল্পের যে ধারাকে ভুলিয়ে দেওয়ার

পাঁচের পাতায় দেখুন

শিক্ষাক্ষেত্র এখন নৈরাজ্যের স্বর্গরাজ্যে পরিণত

মন্ত্রী বদলালেও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বদলালো কই? নদীয়ার চাপড়া ভক্তরাম বি এড কলেজে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসতেই শিক্ষামন্ত্রী তা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য দ্রুত উঠে পড়ে লাগলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। এই কলেজে বি এড-এ ভর্তির জন্য তৃণমূল ছাত্রপরিষদের তরফে ৩৯ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে থেকে অনৈতিকভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হাংলু ঐ ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্যপাণ্ডা শঙ্কু দেব সদ্য শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত ঐ সংগঠনের ছাত্রনেতাদের বাঁচাতে আর্জি জানায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডা শঙ্কুদেবের আর্জিতে চটজলদি সাড়া দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অভিজিৎ চক্রবর্তীকে দিয়ে ছাত্র ভর্তিতে দুর্নীতির তদন্ত করতে দায়িত্ব দিলেন। মজার ঘটনা হল তাঁদেরই মনোনীত আরেক উপাচার্যের নেওয়া সিদ্ধান্তকে (ঐ কলেজের অনীতিনিষ্ঠভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিল করা) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হল। এ এক আজব রাজ্য! আজব রাজ্যের আজব কাণ্ডকারখানা! একই অভিযোগ উঠেছে ঐ জেলার আরেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবদ্বীপ কলেজেও।

রাজ্যজুড়ে সরকারি দল নৈরাজ্যকে আশ্রয় করে দল ও সরকার পরিচালনা করছে। শিক্ষাঙ্গন নৈরাজ্যমুক্ত হবে ভেবে নেওয়াটা ভুল। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দীর্ঘ দীর্ঘদিন গেড়ে রয়েছে। বর্তমান সময়ে তা আরও প্রকট হয়েছে। শিক্ষায় সাম্প্রতিক নৈরাজ্যের আরেকটি উদাহরণ হল সদ্য প্রাক্তন হওয়া ব্রাত্য বসুর নির্দেশে (শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন) দ্বাদশ শ্রেণীর 'বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বইটির মুদ্রণকে বাতিল ঘোষণা করা। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ হল পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে মুদ্রিত বইটিতে কবীর সুমনের প্রশস্তি পাতার পর পাতা জুড়ে করা হয়েছে। অথচ বাংলার জনপ্রিয় গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে ইত্যাদিদের সেভাবে গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই ঐ বইটির মুদ্রণ বাতিল করা হল। এ যেন হাল্লা রাজার দেশে হাল্লা রাজার খামখেয়ালিপনার রূপান্তর! যখন যা মনে হল তাই করা। যখন যাকে মনে হল তাকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া! এই বই বাতিল হওয়ার পেছনে সমস্যায় পড়বে ছাত্রছাত্রীরা। পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তারা সঠিক সময়ে বই না পেলে পরীক্ষার ফল খারাপ হতে বাধ্য। কবীর সুমনকে যদি ঐ বইয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তাহলেও এক বছর অন্তত অপেক্ষা করা যেত। আসলে এই বই বাতিলের পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তিন বছর রাজত্বকালেই শিক্ষাক্ষেত্রে বহু নৈরাজ্যের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদকে নিয়ে নানা বিতর্ক ও দুর্নীতি ইতিমধ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে।

ব্রাত্য বসুর শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে উচ্চ শিক্ষা সংসদ সভাপতি চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বই বিতর্কে (নিয়ম বহির্ভূতভাবে টেণ্ডার ডেকেও পছন্দের পাবলিশিং হাউসকে বরাত দেওয়া) জড়িয়ে পড়েন। পরে গণমাধ্যমের হৈ চৈ-এ মুক্তিনাথের সভাপতি পদ থেকে সরে যাওয়া। দুর্জনেরা বলে ব্রাত্য বসুও তাঁর পছন্দের প্রকাশককে বরাত পাইয়ে দিয়েছেন। সেই প্রকাশক ব্রাত্যর স্নেহধন্য হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ বিনা পয়সায় ছেপে দিয়েছেন। আরও কিছু ব্রাত্য পেয়েছেন কিনা তা অবশ্য অজ্ঞাত। সুতরাং পার্থ ব্রাত্যর নির্দেশে ছাপানো বই বাতিল করে তাঁদের অপছন্দের কবীর সুমনকে যেমন ছেঁটে ফেলতে চাইছেন একইভাবে তাঁরও পছন্দের প্রকাশককে বরাত পাইয়ে দেবেন এতে আর আশ্চর্যের কি! আশ্চর্যের হল সময়টাকে বেছে নেওয়া। কারণ একটা বই ছাপতে ও তা বাজারে পৌঁছতে বেশ কিছু সময় লেগে যাবে, ক্ষতি হয়ে যাবে পড়ুয়াদের।

অন্যদিক দিয়ে ডিগ্রি কোর্সে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এখন প্রতিদিনকার রোজনামচাতে পরিণত হয়েছে। কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ না থাকায় কলেজ পরিচালনার ভার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সিনিয়র অধ্যাপকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হওয়ার কথা থাকলেও (বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাটুটে অন্তত তাই বলা আছে) ক্ষমতাসীন দল তাদের পছন্দের (জুনিয়র অধ্যাপক হলেও) অধ্যাপককে (যাঁরা দলদাস) ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব দিচ্ছে। অন্যান্য অধ্যাপকরা তাঁকে দলজুজুতে মেনে নিলেও অধিকাংশই মনে মনে তা মেনে নিতে পারছেন না। ফলে কলেজে কলেজে একধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি বঞ্চিত সিনিয়র অধ্যাপক আদালতের শরণাপন্ন হয়ে সুবিচার পেলেও কলেজের পরিচালন সমিতি (অধিকাংশই শাসকদল প্রভাবিত) সেই ব্যক্তিকে দায়িত্বভার তুলে দিতে অস্বীকার করছে। আদালত অবমাননার দায়কেও গায়ের জোরে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে দলতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা। অথচ এরাই ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল দলতন্ত্র নয় গণতন্ত্র তারা প্রতিষ্ঠা করবেন।

পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী বহু কিছু খারাপ কাজ করলেও তিনটি কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট যা সম্পত্তি আছে তার অ্যাসেস করা। জানা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সম্পত্তি বেদখল হয়ে গিয়েছিল। সেই সম্পত্তির পরিমাণ আজকের মূল্যমানে প্রায় ১৩৫০ কোটি টাকা। দ্বিতীয়টি হল সারা বাংলার প্রায় ৪৫০টির মত ডিগ্রি কলেজ আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিকঠাক দিত না। বর্তমানে দিতে হয়। তৃতীয়টি অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা। এই তিন নম্বর কাজেই বাগড়া দেয় পাণ্ডা শঙ্কুদেব। ফলে নেত্রীর নির্দেশে ব্রাত্যর প্রস্থান (শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ) ও পার্থ-র শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে অভিষেক। অভিষেকেই পার্থর চাঞ্চল্যকর নির্দেশ—অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া হবে না, যেমন চলছিল তেমন চলবে। চলছেও তাই।

অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে চালু হলে কলেজে কলেজে পাণ্ডা শঙ্কুদেবদের আর তো প্রয়োজন পড়বে না। কারণ এই ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পয়সা নিয়ে (মেধা তালিকায় না থাকা একটি ছাত্রের পছন্দের বিষয়ে ভর্তি সাধারণভাবে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা বিনিময়ে হয়, অঙ্কটা বাড়ে চাহিদা অনুযায়ী) নিয়মবর্হিভূতভাবে কলেজে ভর্তি করার মধ্যে। ছাত্র ইউনিয়ন এই ভর্তির সঙ্গে জড়িয়ে থেকে সংগঠনে ছাত্র ধরে এবং কলেজ ইউনিয়ন চালানোর খরচ তোলে। বখাটে পাণ্ডারা পকেট ভারী করে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। সে কারণেই মেধা তালিকায় বাইরের নাম ঢোকানোর জন্য ঘেরাও, অবরোধ, ভাঙচুর ইত্যাদি সহযোগে নৈরাজ্য চলতে থাকে। যেমন চলছে কলকাতার সেন্ট পলস কলেজে, বহরমপুর কলেজে, নদীয়ার কলেজে বা অন্যত্র।

শিক্ষার মানোন্নয়নে এদের কারোর মাথাব্যথা নেই। কলেজে কলেজে প্রয়োজন মত শিক্ষক নেই, পরিকাঠামো নেই পঠন পাঠন চালু রাখার জন্য। বহু শিক্ষকপদ দীর্ঘদিন খালি পড়ে আছে। শেষ কলেজ সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০০৯ সালে। সেই থেকে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ আছে। প্রায় ২৫০টি কলেজে অধ্যক্ষ নেই। নামমাত্র বেতনে ৪৫০০ আংশিক সময়ের শিক্ষক কলেজে কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত। তাঁদের আজ অবধি কোন আর্থিক উন্নয়নের ও তাঁদের মর্যাদার কথা পরিবর্তনের সরকার ভাবার সুযোগ পেল না। অথচ বর্তমান সময়ে প্রায় দেড় দশক ধরে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এই শিক্ষকরা তাঁদের অপরিহার্যতা বারে বারে প্রমাণ দিয়েছে। বাম জমানার ৩৪ বছরের রাজত্বে সমালোচনা করা হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যমেধার চাষ হয়েছে। বর্তমান সময়ে এই তিন বছরের পরিবর্তনের সরকারের রাজত্বে বলার বোধ হয় সময় হয়েছে, রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নমেধার চাষের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কারণ, শঙ্কুদেবরাই এখন শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক। এভাবে চললে অরাজকতা শিক্ষাঙ্গনে বাড়বে বই কমবে না। এর দায় কে নেবে?

- হরিবাসর বাগদি

ঘটনা ও প্রবণতা

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গরীব দেশ ভারত

ভারতবর্ষে ৩৪ কোটি দুঃস্থ ও নিঃস্ব মানুষের বাস। সংখ্যা হিসাবে দক্ষিণ এশিয়াতে এটাই সবথেকে বেশী। আর শতাংশের হিসাবে তা আফগানিস্তানের পরেই। সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি-র এক প্রকাশিত সমীক্ষায়। নীচের সারণী থেকে ছবিটা পরিষ্কার হবে।

দেশ	এম পি আই (শতাংশে)	নিঃস্ব (শতাংশে)
নেপাল	৪৪.২	১৯.৯
পাকিস্তান	৪৪.২	২০.৭
বাংলাদেশ	৫১.৩	১৯.২
ভারত	৫৩.৭	২৮.৫
আফগানিস্তান	৬৬.২	৩৭.৭

এম পি আই — মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স—বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক

সমীক্ষায় আরও দেখা যাচ্ছে গরীব মানুষের সংখ্যাতেও ভারতের স্থান আফগানিস্তানের (৬৬.২ শতাংশ) পরেই ৫৩.৭ শতাংশে। গরীব মানুষের সংখ্যাটা মাপা হয়েছে মূলত এখানে বি পি এল যেভাবে মাপা হয় সেভাবে। সমীক্ষাতে সবচেয়ে দুঃস্থ অঞ্চল হিসাবে বিহারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর রয়েছে দক্ষিণ আফগানিস্তান। — *দি হিন্দুস্তান টাইমস, ১৬ জুন ২০১৪*

ওয়াজিরিস্তানে ৩ লক্ষ গৃহহীন

প্রশাসন-তালিবান সংঘাতে গত এক সপ্তাহে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তত ৩.৫ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পালিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজারের বেশি শিশুও।

প্রবল গরমেও এতটুকু কমেনি গাড়ি ও মানুষের ভিড়। যেটুকু সহায় সম্বল রয়েছে সবকটি তোরঙ্গে ভরে বা পুঁটলি পাকিয়ে ভিড়ে ঠাসা বাস বা ট্রাকে বসে রয়েছেন ওঁরা। সেনাকর্মীদের দয়া হলে কিছুক্ষণের জন্য খোলা হবে সীমান্ত। তবে ওঁরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের দিকে এগোতে পারবেন অথবা পারবেন পাকিস্তানে ঢুকতে।

এঁরা সবাই মিরানশাহ বা মির আলির মতো উত্তর ওয়াজিরিস্তানের একাধিক শহরের বাসিন্দা।

গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গিদের ডেরা লক্ষ করে বিমানহানা যাতে এখনও পর্যন্ত ২৫০-এর বেশি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গিদের অনেকেই ঘন বসতি এলাকায় নেমে এসেছে পার্বত্য গোপন আড্ডা ছেড়ে। ফলে, এই এলাকাতেও হামলা চালাতে শুরু করেছে সেনা।

প্রাণ বাঁচাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও খাইবার-পাখতুনখওয়া এবং পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে মানুষ আফগানিস্তানে পালাতে শুরু করেছেন। পাকিস্তান সরকার বান্নু শহরে একটি শরণার্থী শিবির তৈরি করেছে। কিন্তু ঐ শিবিরে পানীয় জল, খাবার ও নিকাশির কোনও বন্দোবস্ত নেই। — *এই সময়, ২৩ জুন ২০১৪*

কাদের টাকা আছে সুইস ব্যাঙ্কে? তালিকা তৈরি

সুইৎজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে জমে থাকা কালো টাকার সুলুক সন্ধানে এক ঝলক আশার আলো দেখা গেল। সন্দেহভাজন ভারতীয় ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করছে সুইৎজারল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ। দেখা যাচ্ছে, এই সব অ্যাকাউন্টের পেছনে ঠিক কারা রয়েছে, বা কারা এর সুবিধাভোগী। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেও দেওয়া হচ্ছে তথ্য। জানিয়েছে আজ সুইস সরকারের একটি সূত্র। তালিকায় কাদের নাম আছে, তা অবশ্যই প্রকাশ করেননি সুইৎজারল্যাণ্ডের সরকারি সূত্র। বলেছেন দু-দেশের সরকারের মধ্যে তথ্য লেনদেনের যে বোঝাপড়া রয়েছে, তাতে নাম প্রকাশ করা যাবে না। তা ছাড়া যে পথে এই টাকা সুইস ব্যাঙ্কে এসেছে, সেটাও কিছুটা ঘোরালো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ভারতের বাইরে থাকা কোনও ডমিসিলিয়ারি কোম্পানি বা ট্রাস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে টাকাটা পাঠানো হয়েছে। অর্থের উৎস খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে আসছে ভারতীয়দের নাম। সুইৎজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এস এন বি সদ্য জানিয়েছে, এই দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ২০১৩ সালে ভারতীয়দের জমানো অর্থ ৪৩ শতাংশ বেড়ে প্রায় ১৪,০০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ভারতে নানা সময় অভিযোগ উঠেছে, এদেশ থেকে সুইস ব্যাঙ্কে পাচার হওয়া টাকার পরিমাণ মার্কিন মুদ্রায় বহু ট্রিলিয়ন ডলার। সুইস সূত্র তা খারিজ করে দিয়ে বলেন, সুইৎজারল্যাণ্ডের ২৮৩টি ব্যাঙ্কে বিদেশ থেকে আসা মোট অর্থের পরিমাণই ১.৬ ট্রিলিয়ন ডলার। ভারতীয়দের জমানো টাকার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি রয়েছে দুটি বড় ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক দুটির নাম ইউ বি এস এবং ক্রেডিট সুইস। — *আজকাল, ২৩ জুন ২০১৪*

বন্ধ রায়পুর চা বাগানে ...

একের পাতার পর

থেকে বিভিন্ন চর্মরোগ হচ্ছে। শ্রমিক আবাসনগুলোর মধ্যে চলাচলকারী পথগুলো বিশ্রীভাবে কাদায় ভরা, চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শ্রমিক আবাসনগুলো ভাঙাচোরা, ১০ বছরের বেশি সময় কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি, বৃষ্টির জল পড়ছে সরাসরি ঘরের ভেতর। পানীয় জলের জন্য শুধুমাত্র দুটি টিউবওয়েল ভরসা। যার একটি রয়েছে বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই দুটি টিউবওয়েলের উপর বাগানের ৫৮৮টি শ্রমিক পরিবারের ভরসা। চিকিৎসা পরিষেবার মান খুবই নিম্নমানের। সপ্তাহের তিনদিন একটি বেসরকারি সংস্থার, বাকি তিনদিন সরকারি ব্যবস্থায় চিকিৎসা চলছে, শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা।

বন্ধ চা বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে মাসিক ২ টাকা কেজি দরে জনপ্রতি ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম চাল ও ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম গমের খাদ্যমান খুবই নিম্নস্তরের, চাল পোকায় ভর্তি। ৬টি জীবন চলে যাওয়ার পর ৩ মাস বাদে ১২ কিলো চাল জি আর হিসাবে পাওয়া গেছে।

উপস্থিত শ্রমিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাঁদের দাবি সম্পর্কে। তাঁরা একসুরে স্পষ্ট বললেন, কোন নেতা-মন্ত্রীর দাক্ষিণ্য চান না। তাঁরা চান চা-বাগান পুনরায় কোন সুযোগ্য নিয়ন্ত্রণে চালু হোক এবং রাজ্য সরকারকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। বাগান খোলার সাথে সাথে চা বাগিচা শ্রম আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। পরিকাঠামোগত সংস্কার (শ্রমিক আবাস, পথঘাট) করতে হবে। পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঠিকঠাক করতে হবে। চা বাগান গ্রাম পঞ্চায়েত এক্তিয়ারভুক্ত হলেও তার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। শ্রমিকেরা চান বাগানের প্রায় ৬০০ একর জমিতে নতুন করে চা-গাছ রোপণ করতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিচর্যা বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক গুণমানে করতে হবে।

ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসার সময় সবচেয়ে হৃদয়বিদারক মন্তব্য করলেন শ্রমিক বিজয় ওরাওঁ। তিনি বললেন, বাগানে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বিভিন্ন সংসদীয় দলের নেতা-মন্ত্রীরা ধোপদুরস্ত বেশভূষা পরে শতাধিক গাড়ীর মিছিল নিয়ে আমাদের দেখতে আসেন—সাথে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। এসব করে তাঁরা আমাদের তুষ্ট করতে চান। তাঁদের এই মনোভাবকে আমরা ঘৃণা করি।

রাজ্যে একশ দিনের কাজ বন্ধ আর বকেয়া মজুরির পাহাড় কেন?

কোষাগারে টাকা নেই, মজুরি প্রচুর বকেয়া তাই রাজ্য সরকার একশ দিনের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বকেয়া মজুরি কবে দেওয়া হবে সেই নিশ্চয়তা কিন্তু দিচ্ছে না। একশ দিনের কাজ পঞ্চায়েত মন্ত্রকের আওতায়। পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেছেন তিনি এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন। মজুরি মেটানোর উপায় কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এখনই পুনর্বিবেচনার কথা ভাবতে রাজী নন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মজুরি দেওয়ার সংস্থান নিয়ে কথা বলার প্রতিশ্রুতি এক পক্ষকাল গড়াতে গেল এখনও নতুন কোন আশ্বাস মিলছে না।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখন বর্ষাতেই ভরসা খুঁজছেন। কাজ দিতে না পারা, মজুরি দিতে না পারার অপদার্থতা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে। বর্ষা এলে চাষবাসের কাজ গতি পাবে, তাহলেও বঞ্চিত মজুরদের মন ঘোরানো যাবে। সরকার নিজেই পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক করে তুলেছে। আবার পরিত্রাণের পথ খুঁজছে বর্ষার মধ্যে। কিন্তু সে বর্ষাও যথেষ্ট বিলম্বিত হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই ঘাটতি চলছে ৫৭ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে একশ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে সংস্থান হয়েছে ৩৮ দিন মাত্র। মমতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটাই সর্বোচ্চ সংস্থান। এটা আদৌ বড় মুখ করে দাবি করার নয়। কি বিগত বামফ্রন্ট আমলের তুলনায়, কি বর্তমান অন্য কিছু রাজ্যের তুলনায়। বামফ্রন্ট আমলে ২০০৪ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সাত বছরে কর্মসংস্থান হয়েছিল সর্বোচ্চ গড়ে ২৬ দিন মাত্র। তারপর তৃণমূল আমল চলছে তিন বছর। এই সময়ে কর্মসংস্থান বাড়িয়েছে ১২ দিন বেশী মাত্র। অন্তত সর্বশেষ ২০১৩-১৪-র হিসাব অনুযায়ী। এই কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যদিও বর্তমানে অন্য কোন রাজ্য বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। সব রাজ্যেই কম-বেশী গয়ংগচ্ছ মনোভাব। আইন ও প্রকল্প চালু হওয়ার এক দশক পরেও কোনও রাজ্যই কর্মসংস্থানে ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তবু অপেক্ষাকৃত এগিয়ে রয়েছে কয়েকটি রাজ্য। যেমন, গত আর্থিক বছরে কেরালায় ও কর্ণাটকে পরিবারপিছু গড়ে ৫৭ দিন; ছত্তিশগড়, হিমাচলপ্রদেশে গড়ে ৫২ দিন কাজ হয়েছে। ঐসব রাজ্যে তো স্বঘোষিত 'পরিবর্তন' নিয়ে আসার সাইনবোর্ড নেই, কোন 'মা-মাটি-মানুষের' দাবি করা সরকার নেই, নিজের সরকারের কাজের ওপর নিজেই নম্বর দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রী নেই। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এই কর্মসংস্থান এতো শ্লথতা, পশ্চাদপদতা ও অবহেলার শিকার হচ্ছে কেন?

এরাজ্যে এই কর্মসংস্থানকে কেন্দ্র করে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা যা তা প্রশ্নাতীত নয়। সংবাদ মাধ্যমের খবর যদি সত্যি হয়, পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী হিসাব শোনাচ্ছেন, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে মজুরি ও কাঁচা মালের দামবাবদ বকেয়ার পরিমাণ মোট ১৯৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে কত টাকা বকেয়া মজুরি বাবদ আর কতটা কাঁচামাল কেনা বাবদ, কি সেই কাঁচামাল সমূহ, সেসব বিস্তারিত তথ্য এখনও সংবাদ জগতে রাখা হচ্ছে না। পঞ্চায়েতমন্ত্রীর আরও দাবি হল এই প্রকল্পে বাৎসরিক যা মোট বরাদ্দের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার সেই অঙ্কের টাকা দিচ্ছে না। যে মনমোহন সরকার বিদেয় হয়েছে সেই সরকারও দিয়ে যায়নি, আর 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া মোদী সরকারও দিচ্ছে না। পঞ্চায়েতমন্ত্রীর বক্তব্য হল, তিনি রাজ্যের অর্থদপ্তর থেকে ৬৫৬ কোটি টাকা ধার নিয়ে বকেয়া পরিস্থিতি সামলেছেন। কী সামলেছেন ঝেড়ে কাশছেন না। মজুরি দিতে, না কাঁচামালের দাম মেটাতে। মন্ত্রীর কথা পরিষ্কার নয়। পঞ্চায়েতমন্ত্রী পরন্তু বলেছেন, চলতি আর্থিক বছরের শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই কর্মসংস্থান প্রকল্প বাবদ ১৭৮৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকা রাজ্যের অর্থদপ্তরকে ঋণ পরিশোধ করা হয়। আর বকেয়া মজুরি মেটানো হয় ১২১১ কোটি টাকা। এই হিসাবে অনুসারে মজুরি বকেয়া থেকে যাচ্ছে (১৯৬২-১২১১) ৭৫১ কোটি টাকা। অবশ্য যদি কাঁচামালের দাম বকেয়ার পরিমাণটা ১৯৬২ কোটি টাকার বাইরে হিসাবে ধরা হয়। অন্যদিকে রাজ্য অর্থদপ্তরকে ২০০ কোটি টাকা এবং মজুরি বাবদ ১২১১ কোটি টাকা দেওয়া হয়, তাহলে তো কেন্দ্রের দেওয়া অর্থ থেকে রাজ্য সরকারের হাতে আর ৩৭২ কোটি টাকা থাকার কথা। সে টাকার হিসাব কোথায়? তারপরে, এপ্রিল থেকে জুন '১৪—তিনমাসে এই প্রকল্পে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দাবি করেছেন কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে মোট ২ লক্ষ। এতে মজুরি মেটানো হয়েছে ১৪১ কোটি টাকা, বকেয়া মজুরির পরিমাণ ৫৭৪ কোটি টাকা। ১৪১ কোটি টাকা মেটানো হল কোন্ সঙ্গতি থেকে? তা কি হাতে থাকা ৩৭২ কোটি টাকা থেকে? যদি তাইই হবে, তবে ৩৭২ কোটি টাকাই বকেয়া মজুরি বাবদ মেটানো হল না কেন? নাকি এটা উপরন্তু পুরানো প্রাপ্যদের একাংশকে বঞ্চিত করে নতুন প্রাপ্যদের একাংশকে মজুরি দেওয়া মাত্র! 'ভাগ করে মজুরি দাও' আর 'যত পারো মজুরি ফেলে রাখো'—পরিকল্পিত পলিসি চলছে! প্রকৃত অর্থে, লক্ষ লক্ষ মজুরকে তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী মুখে বলছেন বিহিত খুঁজতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন, তলে তলে 'বর্ষামঙ্গলের' অপেক্ষায়। মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা, নীরবতাও যথেষ্ট প্রশ্ন তোলার। নাহলে, একশ দিনের কাজে এতো শোচনীয় ব্যর্থতা থেকে যাচ্ছে, তবু তিনি পঞ্চায়েতমন্ত্রককে ভালো কাজের নম্বর দিচ্ছেন!

একশ দিনের কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ করার ব্যাপারে কেন্দ্রের অনেক চালবাজী হয়ত রয়েছে। কিন্তু সব দোষ কেন্দ্রের, এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়াটাও চালাকী। কেবলমাত্র কেন্দ্রই যদি যত গণ্ডগোলের কারণ তবে কেন্দ্রের সাথে হেস্তনেস্ত করা হচ্ছে না কেন! রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে শুধু কেন্দ্রের পাওনা থেকে 'মোরাটোরিয়াম'-এর ছাড় পেতে। দরবার বলুন, দর কষাকষি বলুন, ইস্যু শুধু ঐ 'মোরাটোরিয়াম'। একশ দিনের কাজের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে সংঘাতে যাওয়া হচ্ছে না কেন? এখন তো লোকসভায় দলের সাংসদ সংখ্যা ৩৪। এদের বেশীরভাগই গ্রামভিত্তিক লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। তালেবর জনপ্রতিনিধিরা ভোট পেতে প্রতিশ্রুতির তুবড়ি তো কম দেখাননি। তাদের মুখে ঐ মজুরি প্রশ্নে কোন শব্দ নেই কেন? আসলে তারা সব কেবল দিদি মুখ্যমন্ত্রীর জো-হুজুর। দিদির মুখে বকেয়া মজুরি মেটানোর নাম নেই। তাই দিদিতন্ত্রের প্রসাদভোগী দল-প্রশাসন-জনপ্রতিনিধিদের মুখে ঐ মজুরি প্রশ্নে কুলুপ আঁটা। অথচ একশ দিনের কর্মসংস্থান সম্পর্কে গৃহীত আইনে বলা আছে, কর্মহীন সক্রিয়দের খুঁজে কাজ দিতে হবে, কাজ হয়ে গেলে সাতদিনের মধ্যে মজুরি দিতে হবে। মমতা সরকার কার্যত আইনের তোয়াক্কা করছে না। চটকল মালিকদের মতই এই সরকারের আচরণ। পশ্চিমবাংলার চটকল মালিকরা যেমন হাজার হাজার জুট শ্রমিকদের মজুরি, পি এফ, গ্র্যাচুইটির পাওনা কোটি কোটি টাকা মেরে চলছে। শাসক বদলেছে, কিন্তু চটকল মালিকদের পুঁজি লুঠের অবাধ ক্ষমতা ভোগ করার পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। একই কারবার গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মজুরি প্রশ্নে খোদ রাজ্য সরকার চালাচ্ছে। এই সরকার খুব আইনকে আইনের পথে চলতে দেওয়ার বুলি ঝাড়ে! কিন্তু কর্মসংস্থানের মজুরির বেলায়! ভণ্ডামী ধরা পড়ে যাচ্ছে।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কমিটি বৈঠক চার দফা কর্মসূচী নিল

২৯ জুন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগরে সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাজ্যে বিজেপির উত্থান, পরিবেশকে নষ্ট করার সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত এবং তৃণমূলের লাগাতার হামলার বিরুদ্ধে রাজ্য কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। গত নির্বাচনে লক্ষ্য করা গেছে যে গরিব শ্রেণীর দাবিগুলো জোরালোভাবে সামনে আসতে পারেনি। বি পি এল তালিকা থেকে ব্যাপক মানুষের নাম বাদ চলে যাওয়া, বহু মানুষের বার্ধ্যক্যভাতা বাতিল হয়ে যাওয়া, সরকারি মজুরি লাগু না হওয়া এবং ১০০ দিনের কাজ ও সরকারি গৃহ প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ভোট দেওয়ার সময় গরিব মানুষের মূল দাবি হয়ে উঠতে পারেনি। এই দাবিগুলোকে প্রচারে নজরকাড়া প্রাসঙ্গিক করে তুলতে কৃষিমজুর সমিতি চেষ্টা চালায়, অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না।

গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল এখন তার ভিতকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারেনি বরং ক্রমাগত তাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি তৃণমূলের লাগামছাড়া হামলার বিরুদ্ধে সি পি এমের উদ্যোগহীনতার ফলে গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। এইরকম পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠনকে শ্রেণী দাবিগুলোকে সামনে নিয়ে এসে লড়াই-সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য রাজ্য কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে—

(১) ধান রোয়া থেকে ধান কাটার মধ্যে মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলন সংগঠিত করা।

(২) উপরোক্ত দাবিগুলো নিয়ে জুলাই মাসের মধ্যে পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া।

(৩) আগস্ট মাসের মধ্যে জেলা কর্মী বৈঠক করা।

(৪) ১ সেপ্টেম্বর সমস্ত জেলায় ডি এম দপ্তরে অবস্থান-ডেপুটেশন সংগঠিত করা।

৬-৭ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কাউন্সিল বৈঠক হবে। প্রত্যেক দায়িত্বশীল নেতাকে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে কাজকে কেন্দ্রীভূত করে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখা হয়।

- কাজল দত্তগুপ্ত

... শিল্পীর দায়িত্ব"

তিনের পাতার পর

মানুষের জন্য বিকাশ ভৌমিকের চিত্র প্রদর্শনীতে মানুষের ভীড়। আলোকচিত্র ঃ কস্তুরী

চেষ্টা হচ্ছে সেকথা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। উঠে আসেন জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ হোড়, কামরুল হাসান। কথায়। ছবিতে। প্রায় দেড়শো স্লাইডে একের পর এক শিল্পীর ছবি দেখিয়ে বিষয়টি পরিস্ফুট করেন। বৃষ্টি মাথায় নিয়েও অনেক মানুষ সেমিনারে আসেন। বক্তব্যের শেষে প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যার রেশ চলতে থাকে আবার ছবিগুলির সামনে। বৃষ্টি শেষের ভেজা রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে আমরা মাথায় নিয়ে চলছিলাম অন্ধকার সময়ে শিল্পীদের উজ্জ্বল ছবিগুলি।

- কস্তুরী

চারু মজুমদার এবং তাঁর উত্তরাধিকার

পাওয়া যাচ্ছে **মূল্য ঃ ৩০ টাকা**

"আজকের দেশব্রতী" গ্রাহক হোন

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত ইংরাজী সাপ্তাহিক "আপডেট" গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

রাজনীতি এখন ঃ অভিসারী প্রবণতা ও অপসারী সম্ভাবনাসমূহ

বিপ্লবী শক্তিকে আন্দোলন সংগ্রামের মুহূর্তকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক শক্তির মূল্যেই বিজেপির বিপুল বিজয় সম্ভব হয়েছে। আর এই বিজয়ের পেছনে মূলত সাহায্য করেছে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট শক্তি। এই বিজয়কে কাজে লাগিয়ে যে কর্পোরেট দাক্ষিণ্য নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, তার ইচ্ছাপূরণে দ্রুতই তাকে মাঠে নেমে পড়তে হয়েছে। 'আচ্ছে দিন'-এর ধারণাকে বাক্সবন্দী করে তেতো বড়ি খাওয়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে। বাজেটের আগেই রেল ভাড়া অবিশ্বাস্য রকম বেড়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে রেলের যাত্রিভাড়া ও মাশুল বাড়ানোতেই থামতে রাজী নয় সরকার। এবার বিপুল ঘাটতির বোঝা কমাতে রান্নার গ্যাস ও কেরোসিনের ওপর থেকে ভর্তুকি কমানোর কথা চিন্তা করছে কেন্দ্র। সারের দাম, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প এবং একশো দিনের কাজের ওপরেও ভর্তুকি ছাঁটার কথাও ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, সারের জন্যও ভর্তুকি বহন করতে রাজী নয় সরকার। বিপুল ভর্তুকির কথা মাথায় রেখে আপাতত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের রূপায়ণ আরও কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে অর্থ মন্ত্রক। খাদ্য ও গণবন্টন ব্যবস্থার প্রতিমন্ত্রী দাদারাও ডানভে বলছেন, ''খাদ্য নিরাপত্তা বিলের যে সব খামতি রয়েছে, আমরা সেগুলো পরিমার্জন করব।'' সেই সঙ্গে কৃষি মন্ত্রকের এক আমলার মতে, খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হলে সারের ব্যবহারও বাড়বে। তার জন্য সারের দামের বিষয়টিও নতুন করে পর্যালোচনা করা দরকার হবে।

মোদি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি করতে চাইছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে। আর সে পথে নাকি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মনমোহন জমানার কয়েকটি আইন। তার অন্যতম হল সম্প্রতি পাশ হওয়া জমি অধিগ্রহণ আইন। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি আইনটি আরও সরল করার চেষ্টা করছেন। এই আইন পাশ করার সময়েই শিল্পমহলের তরফে কিছু আপত্তির কথা জানানো হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, যে হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে প্রকল্পের খরচ অনেক বেড়ে যাবে। জমি পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিতিন গড়কড়ির জমি অধিগ্রহণ আইনকে 'সরল' করতে চাওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়।

বদল আনার কথা ভাবা হচ্ছে শ্রম আইনের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে হায়ার অ্যাণ্ড ফায়ার নীতিকে আরও তীব্র করে তাকে আরও কর্পোরেট বান্ধব করার কথা ভাবা হচ্ছে। রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ টানতে তিনটি আইন সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট, ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট ও কনট্রাক্ট লেবার অ্যাক্ট। এর মধ্যে প্রথম আইনটি সংশোধন হলে ৩০০ জনকে ছাঁটাই করতে হলে সরকারের অনুমতি লাগবে না। আগে যেটি ১০০ জনের ক্ষেত্রে ছিল। এই আইনটি কেন্দ্রেও চালু করা যায় কি না, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরকে তা পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন মোদী। সব মিলিয়ে 'আচ্ছে দিন'-এর চেহারা শ্রমজীবী জনগণ, শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের কাছে কি চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে তা স্পষ্ট।

বিজেপির এইসব নীতিমালার রূপায়ণ যে তাকে দ্রুতই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার গরিমা থেকে গণ আন্দোলনের তোপের মুখে ফেলবে, সেটা বোঝা কঠিন নয়। বিজেপি বিরোধী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিক্ষুব্ধ জনাধারকে কতটা নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন, সেটা অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর এ জন্য তাদের অবশ্যই আন্দোলনমুখর, সংবেদনশীল এবং রণকৌশল-নিপুণ হতে হবে।

নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর্বে বিজেপি যে সমস্ত রাজনৈতিক ধারা থেকে জনাধারকে নিজের দিকে নিয়ে আসতে পেরেছিল, তারা সবাই এই পর্বে নিজেদের জনাধার ফিরে পেতে সচেষ্ট থাকবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন থাকবে তেমনি কারও কারও সাথে কিছু আন্দোলনের ঐক্যও সম্ভব।

বস্তুতপক্ষে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বহুদিন পর দেখা গেছে এক আশ্চর্য অভিসারী প্রবণতা। কংগ্রেস-সামাজিক ন্যায় আন্দেলন (সোশ্যাল জাস্টিস ক্যাম্প)-সমাজগণতন্ত্রী বাম-বিপ্লবী বাম—এরা নির্বাচনে কমবেশী নিজের নিজের শক্তি হারিয়েছে এবং সেই শক্তির মূল্যেই মোদি ও বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে। চরম দক্ষিণপন্থার এ এক বিরাট বিজয় এবং ক্ষমতায় এসেই সে তার বিজয়কে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্রতী হয়েছে।

কংগ্রেস প্রত্যক্ষতই গোটা দেশে তার শক্তি সবচেয়ে বেশি রকম খুইয়েছে, আর সেটা বিজেপির উত্থানে সবচেয়ে বড় আহুতি হিসেবে থেকেছে। কংগ্রেস ভারতীয় পুঁজিপতিদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল, কিন্তু নানা কারণেই শেষমেষ এই নির্বাচনে পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের প্রথম পছন্দের দলকে বেছে নিয়েছে। ইউ পি এ (এক) এবং (দুই)-এর সময়কালে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জোট রাজনীতির পর্বে সে বাম ও সামাজিক ন্যায় আন্দোলন ধারার শক্তিগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় এসেছিল এবং ঘোষণা করেছিল গ্রামীণ রোজগার যোজনা, কৃষিঋণ মকুব, সর্বশিক্ষা অভিযান, মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, খাদ্য নিরাপত্তার মত কিছু প্রকল্প। স্বভাবসুলভ বিপুল কর্পোরেট ছাড়, কর্পোরেট লুণ্ঠন উপযোগী খনি, জমি ইত্যাদির বিপুল দানছত্রকেও কর্পোরেট শক্তি যথেষ্ট বলে মনে করেনি এবং সামাজিক প্রকল্পগুলোকে দেখিয়ে ঘুরিয়ে একেই (কর্পোরেট বান্ধব) নীতিপঙ্গুত্ব বলে প্রচার চালানো হয়। এই সূত্রেই সামনে আসে দুই প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও জগদীশ ভগবতীর বিতর্ক। কংগ্রেসকে ছাপিয়ে বিজেপি কর্পোরেটের প্রথম পছন্দ হয়ে ওঠার জন্য আরও আগ্রাসী কর্পোরেট প্রীতির প্রতিশ্রুতি রাখে। পুঁজিপতি শ্রেণীর নির্দেশেই পেছনে পাঠানো হয় রামমন্দির ও আগ্রাসী হিন্দুত্বের এজেণ্ডাকে, যদিও তাকে কখনোই বাতিল করে দেওয়া হয়নি।

ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি প্রথম থেকেই তার কর্পোরেট বান্ধব নীতি নিতে শুরু করেছে। রেলভাড়া বৃদ্ধি, বিমানবন্দরে প্রাইভেট জেট-এর জন্য বিপুল ছাড়, প্রসারিত এফ ডি আই লগ্নি, সরকারি ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাপক পি পি পি মডেল নিয়ে আসার মত একগুচ্ছ ঘোষণা এর মধ্যেই হয়ে গেছে এবং মোদি নিজেই তেতো বড়ির জন্য জনগণকে প্রস্তুত হতে বলেছেন। বিভিন্ন ভর্তুকি ছাড়ের কথা শোনা যাচ্ছে, যা আগেই উল্লেখ করেছি।

মণ্ডল বা সামাজিক ন্যায় আন্দোলন ঘরানার (সোশ্যাল জাস্টিস ক্যাম্প) দলগুলো—এস পি, বি এস পি, আর জে ডি, জেডি (ইউ) এই নির্বাচনে তাদের প্রায় তিন দশকের ধারাবাহিক সাফল্যের পর বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। পশ্চিম ভারতে বড় শক্তি হিসেবে পরিচিত বিজেপি মধ্য ভারত বা হিন্দি বলয়েও এই নির্বাচনে বিপুল জমি পেল। এখানে মণ্ডলকে যেন গ্রাস করে নিতে পারল কমণ্ডল। এই পরিঘটনার জন্য উত্তরপ্রদেশে যেমন মুজফফরনগরের দাঙ্গাকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রথাগত বিজেপি পদ্ধতিতে, তেমনি আবার সাবেকি উচ্চবর্ণের পার্টির অভিধাকে পেছনে ফেলে বিজেপি চেয়েছে নিজেকে দলিত ও পিছিয়ে পড়াদের পার্টিও হয়ে উঠতে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নীচ রাজনীতির বক্তব্যকে পরিকল্পিতভাবে বিকৃত করে বিজেপি এবং মোদি তাকে নীচু জাতের রাজনীতিতে পরিণত করে নিজেকে আক্রান্ত বলে দেখায় এবং হঠাৎই সামনে আনে মোদির 'পিছিয়ে পড়া জাতি'র পরিচয়। অবশ্যই এই কৌশল সফল হয়, কিন্তু একে দীর্ঘস্থায়িত্ব দেওয়ার পথ এখন বিজেপি খুঁজতে শুরু করেছে। আমলা স্তরে হিন্দি ভাষার ব্যাপকতর ব্যবহারের নির্দেশিকা এই কৌশলেরই অঙ্গ। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য বিজেপি বরাদ্দ করেছিল অনুপ্রবেশ তাস। পশ্চিমবঙ্গে তা মুসলিম ভোটকে একীভূত করে তৃণমূলকেই বেশি সাহায্য করলেও অসমে বিজেপিকে এই কৌশল অনেকটাই সহায়তা করেছে।

বরং পশ্চিমবঙ্গে ভোট মেরুকরণে সমাজগণতন্ত্রী বামেদের ভোট ভালোমাত্রায় বিজেপির দিকে চলে গেছে এবং এটা সমাজগণতন্ত্রীদের দীর্ঘদিন ধরে একমাত্র ক্ষমতার রাজনীতিতে আটকে থাকতে থাকতে মতাদর্শগত অনুশীলনের দৈন্যকেই প্রকটভাবে সামনে এনে দিয়েছে। বিজেপির উত্থান সমাজগণতন্ত্রের প্রধান দুর্গেই শুধু বামেদের বিপর্যয়ে ফেলেনি, তা দেশজুড়েও বামেদের অনেকখানি অপাংক্তেয় করে দিয়েছে। সাংগঠনিক দুর্বলতা ও জনভিত্তির ভালোরকম অভাব বেশিরভাগ জায়গায় বিপ্লবী বামেদের বিজেপিকে রোখার পরিস্থিতিতেই যেতে দেয়নি। বিহার বা ঝাড়খণ্ডে শক্তিশালী লড়াই সত্ত্বেও তা বিজয় হাসিলের মত যথেষ্ট উল্লম্ফন ঘটাতে পারেনি।

কিন্তু এই সমস্ত বিপর্যয় বা সীমাবদ্ধতা দীর্ঘমেয়াদী কোনও পরিঘটনা হতে পারে না। বিজেপির প্রতি নির্বাচন-উত্তর তীব্র মোহের পর্ব ধীরে ধীরে কাটতে থাকবে এবং তার থেকে একটা বড় অংশের মানুষ ক্রমশ সরেও আসবে পরিস্থিতির বিকাশের সাথে সাথে। বিশেষত প্রথম থেকেই বিজেপি যে ধরণের আগ্রাসী নীতি নিতে শুরু করেছে তাতে সমাজের বিবদমান শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলোর লড়াই আরও তীব্র হবেই এবং এর পরিণতিতে এক অপসারী প্রবণতা তৈরী হতে বাধ্য। বিজেপি থেকে সরে আসতে চাওয়া জনাধার কোন ধারার রাজনীতিতে কতটা ঝুঁকতে চাইবে বা কোন ধারা তাকে কতটা আত্মীকরণ করতে পারবে সেটা আগামী দিনে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের সূচনা করতে পারে।

মোড় ফেরার মুহূর্তগুলোর পরিণতি কখনোই ইতিহাসে পূর্ব নির্ধারিত নয় এবং ইতিহাসের এই বাঁকগুলোই রাজনৈতিক ঘাতশক্তিসম্পন্ন ছোট শক্তিগুলোর বড় জনাধারসম্পন্ন দলে পরিণত হওয়ার উর্বর সময়। ফলে এই সময়টিকে আমাদের অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

বাম থেকে ডানে যদি আমাদের আলেচ্য রাজনীতির চারটি ধারাকে রাখি তবে তার ছবি পাব এরকম—

বিপ্লবী বাম—সমাজগণতন্ত্রী বাম—সামাজিক ন্যায় আন্দোলনের ঘরানা—কংগ্রেস।

প্রতিটি ধারার মধ্যেই দেখব তার ঠিক দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে ঐক্য-সংগ্রাম নিয়ে একটা বড় বিতর্ক থাকে। বিপ্লবী বামেদের মধ্যেকার একটি চিন্তাধারা যেমন সমাজগণতন্ত্রীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিকে ঝুঁকতে চাইবে, আর একটি অংশ একে অপ্রয়োজনীয় ও 'বিচ্যুতি' বলেই মনে করবে। একইভাবে সমাজগণতন্ত্রীদের মধ্যেও বিতর্ক চলবে সামাজিক ন্যায় আন্দোলনের দলগুলোর সঙ্গে কোন শর্তে কতটা জোট বাঁধা যাবে না যাবে তাকে নিয়ে। সামাজিক ন্যায় আন্দোলনের ধারাটি কংগ্রেসের সাথে জোটের প্রশ্নে অনেক হিসেবনিকেশ কষবে। বিপরীতে দক্ষিণ থেকে যদি বামে আসা যায় তবে দেখব দক্ষিণে থাকা দলগুলো সব সময়েই তার বামে থাকা দলগুলোকে ব্যবহার করে নিতে চাইবে নিজের বৃদ্ধি-বিকাশের স্বার্থে কিন্তু তার সঙ্গে আন্তরিক ঐক্য তার পক্ষে চাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অপেক্ষাকৃত বামের কাছে অপেক্ষাকৃত দক্ষিণের সবসময়েই উন্মোচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

আগামী দিনে ভারতীয় রাজনীতিতে বামেদের দুটি ধারা—বিপ্লবী ধারা ও সমাজগণতন্ত্রী ধারা—রাজনৈতিক ও সামাজিক জোটের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেবে সেটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে যাচ্ছে। তবে বিপ্লবী বামেদের ক্ষেত্রে জোটের সম্ভাবনা বাস্তবতা বিচারের রাস্তাটা লড়াই-সংগ্রামের ময়দান থেকেই ঠিক হবে বলে মনে হয়, ঠিক গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যে দিয়ে নয়। তবে আলাপ-আলোচনা ব্যতিরেকে কোনও সংগ্রাম বা গণ আন্দোলনই শেষমেষ সব প্রশ্নের উত্তর বের করে দেবে, এই চরম অবস্থানও গ্রহণীয় নয়। আলোচনা চলবে, কিন্তু কতটা কি একটা স্থায়ী চেহারা পাবে সেটা আন্দোলনের ময়দানে গৃহীত ভূমিকাই স্থির করে দেবে। আর রেল ভাড়া বৃদ্ধি থেকে নানা ধরনের ভর্তুকি হ্রাস, শ্রম আইনের রদবদল থেকে জমি অধিগ্রহণের আগ্রাসী চিন্তাভাবনা—গণ আন্দোলনের জন্য সত্যিই 'আচ্ছে দিন' আসছে। **- সৌভিক ঘোষাল**

কমরেড চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা

গত ২৯ জুন বালীতে প্রয়াত কমরেড চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল আশুতোষ গ্রন্থাগারের দোতলায়। নীরবতা পালন ও মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অমিতাভ ব্যানার্জী। প্রয়াত কমরেডের দুই কন্যা উপস্থিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ্য কন্যা সম্প্রীতি পিতার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করেন। স্মৃতিচারণা করেন ঘনিষ্ঠ জনেরা। উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য কমিটি সদস্য তপন বটব্যাল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্যাণ গোস্বামী। তাঁদের সামগ্রিক বক্তব্যে উঠে আসে '৬৯-এর উত্তাল সময়ের আহ্বানে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। আলোচিত হয়, ধাক্কা পরবর্তী সময়ে বালীর পৌরাঞ্চলে গণরাজনৈতিক উদ্যোগ, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা, আই পি এফে কমরেড চট্টোপাধ্যায়ের সাহসী ভূমিকার কথা। আজকের সময়ের প্রাসঙ্গিকতায় চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মত যুব-ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার কথাও আলোচিত হয়।

পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল সভার উদ্দেশ্যে এক শোকবার্তায় জানান—রাজনৈতিক সংগঠক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবনে অনেক শারীরিক কষ্ট পেয়েছেন। আই পি এফের সময়ে তার ভূমিকা মনে রাখার মতো। কমরেড চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার ও বালীর কমরেডদের শোকের সাথে তিনি ও পার্টি সহমর্মী।

‘অসরকারি সংস্থাগুলো’ সম্পর্কে আই বি রিপোর্ট

সমালোচকদের ছাপ মারা হচ্ছে ‘‘উন্নয়নের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা’’ বলে

প্রধামন্ত্রীর কাছে পেশ করা ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ‘উন্নয়নের গুজরাট মডেল’-এর প্রতি ‘বিদেশী অর্থপুষ্ট অসরকারি সংস্থাসমূহ’ সৃষ্ট বিপদ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট সম্প্রতি ভারতের সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে ‘ফাঁস’ করা হয়েছে। রিপোর্টটির শিরোনাম ‘উন্নয়নের পথে অসরকারি সংস্থাগুলো সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া’ এবং শোনা যায় রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে পেশ করেছে তদন্তব্যুরো (আই বি)। রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পরপরই ‘বিদেশী অর্থপুষ্ট’ আন্দোলনকারীদের জুজুকে কেন্দ্র করে একটা আলোড়ন ওঠে, কেননা ভারতের উন্নয়নের ইঞ্জিনকে বিপথগামী করতেই নাকি ঐ কর্মীদের অর্থ যোগানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আই বি-র ঐ ‘রিপোর্ট’ ইউ পি এ সরকারের নির্দেশে শুরু হয়েছিল, আর এখন মোদী সরকারের জমানা শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং সরদার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলার সময় তাকে পেশ করা হল।

কেউ এখন এই প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে, ইউ পি এ এবং এন ডি এ, কংগ্রেস এবং বিজেপি কি বিশ্বায়নের একনিষ্ঠ প্রবক্তা নয়? ভারতের অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ওকালতি করে থাকে—কাজেই তাদের পক্ষে ‘বিদেশী অর্থের যোগান’-কে সহসাই বিপদজনক বলে মনে করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

তথাকথিত এই ‘আই বি রিপোর্ট’ পড়লেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রিপোর্টের সঙ্গে নিরাপত্তার কোন সম্পর্ক নেই। এটা কোন ‘তদন্তমূলক রিপোর্ট’ নয় এবং তাতে এমন কোন ‘তথ্য’ নেই যা প্রকাশ্য নয়। ‘ফাঁস করার’ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই ‘রিপোর্টটি’কে তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হয়—এবং উদ্দেশ্য হল, জনমানসে ‘বিদেশী অর্থপুষ্ট’ আন্দোলনকারীদের জুজুকে সঞ্চারিত করা। রিপোর্টটা এতই নিকৃষ্ট যে এর কিছু অংশ ২০০৬ সালে গুজরাটে মোদীর দেওয়া এক ভাষণ থেকে হুবহু নকল করা হয়েছে! আর ‘আই বি রিপোর্ট’ যথার্থই এক রাজনৈতিক আখ্যান, যাতে তদন্তমূলক প্রয়াস চোখে পড়ে না, বরং রাজনৈতিক মতামত ফেরি করতেই তা সচেষ্ট।

ব্যাপারটা এমনই পরিহাসের যে, ‘আই বি রিপোর্ট’ পড়লে এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছে পারা যায় না যে, ‘আই বি’-র কাছে ‘উন্নয়ন’ বলতে ভারতে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলো চালিত প্রকল্পগুলোকেই বোঝায়। খনন ক্ষেত্রে সক্রিয় বহুজাতিক সংস্থা বেদান্ত, পসকো, কুড়ানকুলামে রাশিয়ার অর্থে গড়া পারমাণবিক চুল্লি, জয়িতাপুরে ফরাসি কোম্পানি আরিভার পারমাণবিক চুল্লি, জীন সংশোধিত (জি এম) খাদ্যদ্রব্য থেকে লাভবান হওয়া মনসান্টোর মত বহুজাতিক সংস্থাসমূহ ঃ এই ধরণের সংস্থার স্বার্থকেই আই বি ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে একাকার করে তুলেছে। আর এরই ধারায় এই সমস্ত বিদেশী কর্পোরেশন ও বিদেশী-অর্থে চালিত প্রকল্পগুলোর সমালোচকদের সে ‘জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রতি বিপদ’ বলে ছাপ মেরে দিচ্ছে! উদ্ভট উল্টো যুক্তিতে ভারতের জমি, সম্পদ, জীবিকা ও পরিবেশের লুণ্ঠনকারী বিদেশী কর্পোরেশনগুলোর সমালোচকদের ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র প্রতি বিপদ বলে কলঙ্কিত করা হচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা হল, রিপোর্টে উল্লিখিত অর্থপুষ্ট অসরকারি সংস্থাগুলো একটা অছিলা মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্যটা হল, আমাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কর্পোরেট লুণ্ঠন ও কর্পোরেট এজেণ্ডার বিরুদ্ধে চালিত গণআন্দোলনগুলোকে জাতীয়তা-বিরোধী ও উন্নয়ন-বিরোধী বলে ছাপ মারা। কুড়ানকুলামের আন্দোলন বিদেশী অর্থে চালিত বলে মনমোহন সিং নিজেই এটা করার চেষ্টা করেছিলেন; মোদী সেই উত্তরাধিকারকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কারা ভারতের স্বার্থের প্রতি
‘বিদেশী অর্থ চালিত’ বিপদ?

এ বছর মার্চ মাসে দিল্লী হাইকোর্ট ঘোষণা করে যে বিজেপি ও কংগ্রেস অবৈধভাবে এক বিদেশী সূত্র থেকে টাকা নিয়েছে—এবং সেই সূত্র হল খননে যুক্ত ব্রিটিশ বহুজাতিক সংস্থা বেদান্ত ও তার শাখা সংস্থাগুলো। এফ সি আর এ আইন ভেঙ্গে অর্থ নেওয়ার জন্য বিজেপি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে দেয়।

কংগ্রেস, বিজেপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আদালতের কাছে এই তাজ্জব যুক্তি দেয় যে, বেদান্ত ভারতীয় কোম্পানি বলে তাদের ধারণা ছিল! নিয়মগিরির আদিবাসীরা যদি বেদান্তকে খননে নিযুক্ত ব্রিটিশ বহুজাতিক সংস্থা বলে বরাবরই জেনে থাকে, তাহলে কংগ্রেস আর বিজেপি সেটা জানত না বলে মনে করাটা কি বিশ্বাসযোগ্য?!

কংগ্রেস এবং বিজেপি যখন এফ সি আর এ আইন ভেঙ্গেছে বলে দেখা যাচ্ছে, তখন তাদের পাওয়া অর্থের তদন্ত করা ও তাতে নিয়ন্ত্রণ আনার সুপারিশ আই বি করছে না কেন? যে অসরকারি সংস্থাগুলো আইন ভাঙ্গেনি তাদের পিছনে ছোটা হচ্ছে কেন? সম্ভাব্য ঘটনা কি এটাই নয় যে, বেদান্ত ও এই ধরণের অন্যান্য সংস্থাগুলোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর স্বার্থকেই ভারতের উন্নয়নের পথকে নির্দেশিত করতে দিয়ে কংগ্রেস এবং বিজেপিই ভারতের স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলছে?

বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাসমূহ এবং ভারতের কর্পোরেশনগুলো ভারতের রাজনৈতিক দল ও সরকারগুলোকে প্রভাবিত করে ভারতের উন্নয়ন এজেণ্ডাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে বলে যে অভিযোগ আমরা করে থাকি তা কি বাম মতাদর্শের প্রতি আমাদের পক্ষপাত প্রসূত? তা কিন্তু একেবারেই নয়। বস্তুত, এই কর্পোরেশনগুলো যে আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে নির্লজ্জভাবে ভেঙ্গেছে তার বহু অকাট্য প্রমাণই রয়েছে।

ভারতের আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগুলোর ভারতীয় নাগরিকদের এবং পরিবেশের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বার্থকে সুরক্ষিত করারই কথা। কর্পোরেশনগুলো যখন এই সমস্ত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলোতে ঢুকে পড়ে তখন ঠিক কি ঘটে?

এর বহু উদাহরণই আছে। চিদাম্বরম বেদান্তর ডিরেক্টর ছিলেন এবং খননে যুক্ত বিবিধ কর্পোরেশনের উকিলও ছিলেন এবং পরে তিনি কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। যে কোম্পানিগুলো কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁকে বেতন দিয়ে এসেছে মন্ত্রী হওয়ার পর সেই কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষাকারী অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা নীতি তিনি যে রচনা করবেন তাতে খুব বিস্ময়ের কিছু কি থাকতে পারে?

আমাদের বর্তমান অর্থমন্ত্রীও এর ব্যতিক্রম নন। উইকিলিকস উন্মোচিত তারবার্তা থেকে জানা গেছে, অরুণ জেটলি মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কে বিজেপির বিরোধিতা শুধুই লোক দেখানো রাজনৈতিক ঠমক, তিনি আসলে খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পুরোপুরি পক্ষে। মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি তাঁর তারবার্তায় মন্তব্য করেন, জেটলি ‘‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সংযোগগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন (বেশ কিছু মার্কিন কর্পোরেট সংস্থা তাঁর আইনি মক্কেল)।’’ ভারতের অর্থমন্ত্রী জেটলি অতএব ভারতীয় জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করবেন—নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর কর্পোরেট মক্কেলদের?

ভারতে খাওয়ার জন্য জীন সংশোধিত বিটি বেগুনকে চালু করার একটা প্রচেষ্টা কিছুদিন আগে দেখা যায়। ভারত সরকার গঠিত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুমোদন কমিটি (জি ই এ সি) বিটি বেগুন স্বাস্থ্য বা পরিবেশের কোন ক্ষতি করবে না দাবি করে তাকে ছাড়পত্র দেয়। কিন্তু পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা দেখতে পান যে, জি ই এ সি আদৌ নিরপেক্ষ সংস্থা নয়, কেননা তার মধ্যে সেই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি রয়েছে যারা বিটি বেগুন থেকে প্রচুর লাভবান হতে পারে!

জি ই এ সি-র সহ চেয়ারম্যান সি ডি মায়ী ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অফ এগ্রি-বায়োটেক (আই এস এ এ এ) সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, যে সংস্থা মনসান্টো নাম কোম্পানীর অর্থে চলে, আর এই মনসান্টোর হাতে বিটি বেগুনের পেটেন্ট রয়েছে এবং তারাই এর অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিল! এখানে উল্লেখ্য, সি ডি মায়ী ২০০১ সালেও জি ই এ সি-র সহ-চেয়ারম্যান ছিলেন যখন তা বিটি বেগুন চাষের অনুমতি দেয় এবং এর চার বছর পর তিনি আই এস এ এ এ-র পরিচালকমণ্ডলীতে নিযুক্ত হন।

আর একটা উদাহরণ হল সরকার গঠিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের (এফ এস এ) বিশেষজ্ঞ দলগুলো যারা কোক, পেপসি ইত্যাদির মত নরম পানীয়র মধ্যে ফসফোরিক অ্যাসিড, এথিলিনের মত মিশ্রিত বিষাক্ত পদার্থ এবং অন্যান্য বিপদজনক রাসায়নিকের অস্তিত্ব আছে কি না পরীক্ষা করে থাকে। আন্দোলনের যে কর্মীরা নরম পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপ্রীম কোর্টে যান তাঁরা বলেন, এফ এস এ-র বিশেষজ্ঞ দলগুলো এমন সমস্ত লোকজনে ভর্তি যাদের সঙ্গে পেপসি, কোকাকোলা, নেসলের মত কোম্পানিগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে—অর্থাৎ সেই সমস্ত কোম্পানী যাদেরই নিয়ন্ত্রণ করাই বিশেষজ্ঞ দলের কাজ! সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে, ‘‘বিশেষজ্ঞ দলে নিরপেক্ষ লোকজন নেই; এটা (খাদ্য নিরাপত্তা) আইনের বিরোধী। ঐ বিশেষজ্ঞ দলের কাছ থেকে কি ধরণের সুপারিশ প্রত্যাশা করা যায়?’’

বিদেশী হাত এবং
ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান

নিবেদিতা মেনন লিখেছেন (নিবন্ধের নাম কখন বিদেশী অর্থ স্বাগত? বিভ্রান্ত হয়ে পড়া মানুষের জন্য পথ নির্দেশ। কালিফা, ১৩ জুন ২০১৪), ‘‘ওমিদায়ার নেটওয়ার্ক হল ইবে কোম্পানীর মালিক ধনকুবের পিয়েরে ওমিদায়ারের লোকহিতৈষী শাখা। ২০০৯ সাল থেকে ওমিদায়ার নেটওয়ার্ক অন্য কোন দেশের চেয়ে ভারতেই তার শেয়ারে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে এসেছে। আর এই বিনিয়োগ মূলত হয়েছে জয়ন্ত সিনহার (বিজেপির বড় নেতা যশোবন্ত সিনহার ছেলে) কল্যাণে, যাঁকে ২০০৯-এর অক্টোবরে বেতন দিয়ে নিয়োগ করা হয় ওমিদায়ার নেটওয়ার্ক ইণ্ডিয়া এডভাইসার্স কোম্পানি খুলে তাকে পরিচালিত করার জন্য। ... মোদীকে জেতাতে সাহায্য করতে সিনহা ওমিদায়ার নেটওয়ার্ক ছেড়ে যাওয়ার পরপরই মোদী একটি ভাষণ দেন যাতে ভারতে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্যের বাজার ইবের মত বিদেশী কোম্পানিগুলোর কাছে খুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়, যে কোম্পানীর সবচেয়ে বেশী শেয়ার রয়েছে পিয়েরে ওমিদায়ারের হাতে।’’

ওমিদায়ার কি এন জি ও-দের অর্থ দান করে? ঐ সংস্থা অবশ্যই তা করে, তবে সেই অসরকারি সংস্থাগুলোকেই অর্থ দেয় যারা মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে কাজ করে। মেনন একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, ওমিদায়ার সেই সমস্ত অসরকারি সংস্থাগুলোকেই অর্থে পুষ্ট করেন যাদের কাজ হল ‘‘পশ্চিমের ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা জাতীয় সম্পদ ও কাঁচামালের লুণ্ঠনের পক্ষে যথেষ্ট খোলা নয় এমন সরকারগুলোর পতন ঘটানো।’’

মোদীর নির্বাচনী প্রচারে অর্থ যোগানো এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর নীতিকে প্রভাবিত করা ছাড়াও ওমিদায়ার আরও কিছু করেছে। জয়ন্ত সিনহা—যিনি ওমিদায়ারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখন ঝাড়খণ্ড থেকে নির্বাচিত বিজেপির এক সাংসদ—নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বিজেপির সংস্থা ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন। নীতির রূপকার এই সংস্থা ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশনের নতুন শীর্ষ ব্যক্তি প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান অজিত দোভালকেই মোদী তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা করেছেন। অতএব, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে বিজেপির নীতি নির্ধারক এমন এক সংস্থা থেকে নেওয়া হল যা অত্যন্ত সন্দেহজনক এক বিদেশী কর্পোরেশনের অর্থে পুষ্ট এবং মার্কিন স্বার্থ চরিতার্থতায় নিয়োজিত। এটা কি স্বার্থের বিপদজনক দ্বিমুখী সংঘাত নয়? এটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে ‘আই বি রিপোর্ট’ কোথা থেকে উৎসারিত হচ্ছে?

আমরা দেখতে পাচ্ছি আর এস এস প্রতিদিনই প্রকাশ্যে মোদী সরকারের কার্যধারাকে প্রভাবিত করছে। তাহলে, আর এস এস যে অর্থ পাচ্ছে তার পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তদন্ত হওয়া কি উচিৎ নয়?

ব্রিটেনে আওয়াজ, সাউথ ইণ্ডিয়া ওয়াচ লিমিটেড নামক সংস্থার রিপোর্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতে উন্নয়ন ও ত্রাণ তহবিল সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, কিভাবে আর এস এস-এর বিভিন্ন ‘ফ্রন্ট’ দানশীলতা ও জনহিতকর ত্রাণের নামে অর্থ সংগ্রহ করে—এবং সেই অর্থ সংঘ পরিবারের উগ্রপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কাছে পাচার করে দেয়। যারা অর্থ দান করছে তারা যদি জানত যে এই অর্থ খোলাখুলিভাবে হিটলার ও মুসোলিনির রাজনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত আর এস এস-এর কাছে পৌঁছচ্ছে তবে অধিকাংশ দাতাই অর্থ দিতেন না। অতএব, আর এস এস-ই হল বিদেশী অর্থে পুষ্ট বৃহত্তম অসরকারি সংস্থা যা মিথ্যার ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থকে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক হিংসা সৃষ্টিতে লাগায়।

সি পি আই (এম এল) সর্বদাই কর্পোরেট ও বিদেশী অর্থপুষ্ট সংগঠনগুলোর সম্যক তদন্ত এবং স্বচ্ছতার দাবি জানিয়ে এসেছে—যে সংগঠনগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল ও অসরকারি সংগঠনগুলোও রয়েছে।

সমরেন্দ্র দাসের মত আন্দোলনের কর্মী ও লেখকরা এই কথা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, অর্থপুষ্ট কিছু অসরকারি সংস্থা আসলে কর্পোরেটের স্বার্থ সিদ্ধিতেই কাজ করে এবং নিয়ামগিরিতে বেদান্তর বিরুদ্ধে চালানো গণআন্দোলনগুলোতে নাশকতা চালায়।

তবে আই বি যা করছে তার সঙ্গে অর্থ প্রদানে স্বচ্ছতা বা দায়বদ্ধতা আনার কোন সম্পর্ক নেই। সে আসলে বিদেশী ও কর্পোরেট অর্থে পুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর এজেণ্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই সেই সমস্ত কর্মী ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে, যারা সম্পদের লুণ্ঠন, জীবিকার ধ্বংস, পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় ও বিদেশী কর্পোরেশনগুলোর হাতে নাগরিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছে ও প্রতিরোধ গড়ছে।

(লিবারেশন, জুলাই ২০১৪)

জন্মশতবর্ষে সরোজ দত্ত স্মরণ এবং এই সময় নিয়ে কথা

''এটা ছিল সবচেয়ে খারাপ সময়, সেইসঙ্গে এটা ছিল সর্ব্বোত্তম সময়''—চার্লস ডিকেন্স।

২০১৪ সাল বিপ্লবী, কবি, সাংবাদিক সরোজ দত্তের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের। এই উপলক্ষে গত ২৬ জুন কলকাতার স্টুডেন্টস হলে ''কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা সরোজ দত্ত এবং এই সময়'' শীর্ষক স্মারক আলোচনা সভায় এ টেল অফ টু সিটিজ্‌-এ উল্লিখিত উপরোক্ত শব্দবন্ধগুলো এই সময়ের প্রাসঙ্গিকতায় অর্থবহ হয়ে উঠলো বক্তাদের আলোচনায়। আজ থেকে ৩৯ বছর আগে ২৫ জুন মধ্যরাত্রে তৎকালীন স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছিল জরুরী অবস্থা। ভুখা-নাঙ্গা ভারতবাসীর রুটি, রুজির লড়াই; গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষার লড়াই সহ বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে নির্বিচারে দমন করেছিল শাসকশ্রেণী। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও জেলে বিপ্লবীদের হত্যাকাণ্ডে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে থাকা শাসকের ফ্যাসিবাদী চেহারাটা উন্মোচিত হয়েছিল সেদিন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি নতুন করে শোনা যাচ্ছে, ভারতবাসীর নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার দাবিকে পদদলিত করার প্রক্রিয়া আবারও শুরু হয়েছে।

'৭০-এর দশক ছিল হতাশার শামুক-খোলস ছিঁড়ে খুঁড়ে বেড়িয়ে আসার দশক। প্রতিবাদে প্রতিরোধে, সৃজন ও পুনর্গঠনে, বিপ্লবী শপথের অনন্য এক দশক। কমরেড সরোজ দত্ত ছিলেন বিপ্লবী আশাবাদের ও রূপান্তরের প্রতীক। তিনি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক আজও, এই সময়েও। কমরেড সরোজ দত্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সি পি আই (এম এল)-এর মুখপত্র ''দেশব্রতী'' প্রকাশনায় কর্মরত বর্ষীয়ান কমরেড নিমাই ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক সলিল বিশ্বাস। সভা শুরুর ঘোষণা করেন অধ্যাপক অমিত দাশগুপ্ত। শুরুতে '৭০-এর দশকের শহীদদের উদ্দেশ্যে রচিত গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন নীতীশ রায়-বাবুনী মজুমদার। সভার আয়োজকদের পক্ষ থেকে কমরেড কুণাল দত্ত তার প্রারম্ভিক বক্তব্যে আলোচনা সভার মূল সুরটি বেঁধে দেন।

প্রথম বক্তা মিহির ভট্টাচার্য বলেন, তিনি ছিলেন সরোজ দত্তের সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও তাঁর অনুজ প্রতীম। অমৃতবাজার পত্রিকায় সরোজ দত্ত সাংবাদিকতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাধর অনুবাদক ও ভাষাশিল্পী। অমৃতবাজারে কাজ করার সময় ঐ পত্রিকার কর্মীরা ছাঁটাই ও মজুরি সংকোচনের বিরুদ্ধে এক লড়াই গড়ে তোলেন। সরোজ দত্ত এই লড়াইয়ে সামনের সারিতে ছিলেন। মালিকপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের সামনে লড়াইটি জয়যুক্ত হতে

বক্তব্য রাখছেন পার্থ ঘোষ। বসে (ডানদিক থেকে) অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, নিমাই ঘোষ ও সলিল বিশ্বাস। আলোকচিত্র ঃ মিতালী বিশ্বাস

পারেনি। সাংবাদিকদের প্রায় সকলেই পরে মুচলেকা দিয়ে কাজে যোগদান করেন। ব্যতিক্রম ছিলেন সরোজ দত্ত ও মোহিত মৈত্র—এঁদের চাকরি চলে যায়। অতপর স্বাধীনতা পত্রিকায় যোগদান। রাজনৈতিক প্রবন্ধ, আক্রমণাত্মক ঢঙে সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব ছিল তাঁর। প্যাট্রিস লুমুম্বার লেখা কবিতার অনুবাদও সেই সময়ে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আন্তঃপার্টি বিতর্ক-অলোচনা, দু-লাইনের সংগ্রাম সবেতেই তাঁর অগ্রণী ভূমিকা থাকতো।

সাংবাদিকতার নামে এখন এদেশে যা চলছে তাকে কমিউনিকেশন কাউন্টার রেভোলিউশন বলা যায়। বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠীগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় বহুদিন থেকেই সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলো গুজরাট তথা মোদী ভাবমূর্তি তৈরীর কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। গুজরাটের প্রকৃত অর্থনৈতিক 'বিকাশে'র পক্ষে কোন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের দায় নেই তাদের। এই সময়ে সরোজ দত্তের মত বলিষ্ঠ লেখনীর অভাব বারবার অনুভূত হচ্ছে।

সরোজ দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত নবজাগরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। শ্রী মিহির ভট্টাচার্যের প্রশ্ন ঔপনিবেশিক শাসনে প্রকৃত নবজাগরণ সম্ভব ছিল কি? সংস্কার যা কিছু হয়েছে তা ব্রিটিশ শাসকদের ছত্রছায়ায়। ইতিহাস চর্চা ছিল শিক্ষিত শহুরে বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে—শ্রেণী চেতনা উন্মেষের লক্ষ্যে প্রকৃত লড়াই হয়নি। বাবু সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে ইতিহাসকে।

সঞ্চালক সলিল বিশ্বাস 'এই সময়ে' ফ্যাসিবাদের দর্পিত পদধ্বনি অনুভব করতে পারছেন। তিনি প্রয়াত মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কাব্য গান্ধিনগরের রাত্রির একটি ছোট অংশ আবৃত্তি করে শোনান শ্রোতৃমণ্ডলীকে—

''কব্জি ছিঁড়ে শহর জুড়ে ফিনকি দিল লাল
দূরে ও কাছে দাঁড়িয়ে আছে মরা গাছের ডাল ...''

বক্তা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৪৭ ও তৎপরবর্তী সময়ে সরোজ দত্ত মানবাধিকার আন্দোলন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের পক্ষে এবং এইসব আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে শাসক অনুসৃত চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করেন। ঐ সময়ের স্বাধীনতা পত্রিকা থেকে সংকলিত বেশ কিছু রাজনৈতিক ভাষ্যের অংশ বিশেষ তিনি পড়ে শোনান শ্রোতৃমণ্ডলীকে যা বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। লাঠি-গুলি চালিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী আন্দোলন দমন করার সরকারি নীতি আজও জারী আছে। সরোজ দত্ত লিখেছিলেন যে, '৬৭-'৬৮-তে সরকারি বামেরা বন্দীমুক্তি আন্দোলন করেছিল ঠিকই কিন্তু তারা পি ডি অ্যাক্টের মত কালাকানুন বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হননি।

সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, কমরেড সরোজ দত্ত ছিলেন বিপ্লবী আশাবাদের প্রতীক। চরম সংকটের মধ্যে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন ''বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক''। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সরোজ দত্তের লেখা শুরু হয়েছিল ইতালী, জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের যুগে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সেটা যদি মহামন্দার যুগ হয় বর্তমান যুগটা হলো চিরস্থায়ী রিসেশনের যুগ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা একে পুঁজিবাদের সংকট বলতে রাজি নন। আমরা দেখছি এই অবস্থায় পুঁজির সীমাহীন কেন্দ্রীকরণ ঘটে চলেছে। কর্পোরেটদের হাতে মুনাফার পাহাড় জমা হচ্ছে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আরও প্রান্তিকীকরণ ঘটছে। যে যত ফাটকা খেলতে পারবে সে তত লাভবান হবে। সরকারের রাজনৈতিক এজেণ্ডায় লুকানো আছে জরুরী অবস্থার তাস, অপারেশন গ্রীণহান্ট থেকে শুরু করে ইউ এ পি এ, আফস্পা, টাডা ইত্যাদি দানবীয় কালাকানুনের নিদান রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-আন্দোলন দমন করতে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোগুলোকে তারা নিজেরাই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার অযাচিত হস্তক্ষেপ ঘটল নতুন সরকার মাত্র একমাস ক্ষমতায় আসার পর। স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধী দেশের সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন ৭ বছর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ দখলের পর।

কমরেড সরোজ দত্তের সঙ্গে একই মর্যাদায় উচ্চারিত হয় কমরেড চারু মজুমদারের নামও, যিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখেছিলেন, ''জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ''। বস্তুত লেখাটি ছিল তৎকালীন স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী মানুষদের লড়াইয়ে সামিল করার আহ্বান। আমরাও এই সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থী ও গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ের আহ্বান জানাতে পারি। এই সময়টা নিশ্চয়ই খারাপ সময়, কিন্তু তা সর্বোত্তম সময়ও। এই সময়েই বিরাট প্রতিরোধের সম্ভাবনাগুলোকে আরও উজ্জ্বল করছে। চটকল শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইগুলো সেদিকেই দিক নির্দেশ করছে।

শেষ বক্তা ছিলেন মানবাধিকার ও সমাজকর্মী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিপ্লবী লড়াইয়ের ঝড়ের দিনগুলোকে সরোজ দত্তকে কাছ থেকে দেখেছেন, গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন ঐ চিরতরুণ পার্টির নেতার সহজ সরল জীবন যাত্রা ও তাত্ত্বিক গভীরতা কাছ থেকে অনুভব করে। সরোজ দত্ত বলেছিলেন, 'এই পার্টিতে শুধু সৈনিক নয়, সেনাপতিরাও জীবন দেয়'। সি পি আই (এম এল)-এর ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায় আর কোন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এত বেশী সদস্য প্রাণ দেননি।

সভাপতি শ্রী নিমাই ঘোষ এরপর সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে সভাপতিও এই সময় আর এক সরোজ দত্ত ও চারু মজুমদারের অভাব অনুভব করলেন।

সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন পৃথা চ্যাটার্জী ও বাবুনী মজুমদার।

চলে গেলেন বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমরেড সুশীল রায়

৭৮ বছর বয়সে মারা গেলেন বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা সুশীল রায়। ২০০৫ সালে হুগলী থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি দীর্ঘদিন জেলবন্দি ছিলেন। জেল বন্দি অবস্থায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। অবশেষে বছর খানেক আগে চিকিৎসার জন্য তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপর থেকেই 'এইমস্‌'-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন ক্যান্সার আক্রান্ত এই নেতা। শেষ পর্যন্ত ঐ হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির স্বার্থে তিনি মরণোত্তর দেহদান করে যান।

অকৃতদার সুশীল রায় প্রথম জীবনে কলকাতার ঊষা ফ্যাক্টরিতে পদস্থ কর্মী ছিলেন। স্নাতক হওয়ার পর টেকনিক্যাল শিক্ষাও নিয়েছিলেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ গুপ্তর ভাইপো। তাঁর আদি বাড়ি ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। বাবা ছিলেন সুখেন্দুভূষণ রায়। ছয়ের দশকে সুশীল রায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। মূলত রাঁচি, বোকারো অঞ্চলে শ্রমিক মহল্লায় কাজ শুরু করেন। নকশালবাড়ী আন্দোলনের পর্বে তিনি সি পি আই (এম) ছেড়ে মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারের সদস্য হন। ২০০৪ সালে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী এবং এম সি সি একসঙ্গে সি পি আই (মাওবাদী) গঠন করলে তার পলিটব্যুরো সদস্য হন সুশীল রায়। মাওবাদী তাত্ত্বিক নেতা হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল আপোষহীন লড়াই, সংগ্রামের। কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা অবশ্যই তা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করবেন।

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com